গোয়েন্দার নাম এসিজি

অনীশ দেব



গোয়েন্দার নাম এসিজি

অনীশ দেব

মুখার্জী ব্রাদার্স / কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি—২০০০

প্রকাশক
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
বিজন কর্মকার

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণি
কলকাতা-৪

দাম ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র

দেবযানী মিত্র

সুপ্রিয় মিত্র

প্রীতিভাজনেষু—

সূচি

গোয়েন্দার নাম এসিজি

• পাখি ধরা •

পরনের সাদা ধবধবে পাঞ্জাবির সঙ্গে এক মাথা সাদা ধবধবে চুল একেবারে মিশে গিয়েছিল। বৃদ্ধের শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে অতি-আধুনিক একটা টেপরেকর্ডারের ওপরে। টেপ চলছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম শিসের শব্দ—মিষ্টি এবং কর্কশ স্বর। পাখি ডাকছে।

বৃদ্ধ তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। হাতে খাতা-পেনসিল। নোট নিচ্ছেন। কখনও কখনও ঘাড় নাড়াচ্ছেন। আবার কোনও এক ফাঁকে পেনসিল-ধরা হাতে টান মারছেন শুভ্র চুলের গোছায়। তারপরই চশমার কালো ফ্রেম ঠিকঠাক করছেন।

'গুড মর্নিং, গুপ্তাসাব। সক্কালবেলায় নকলি চিড়িয়ার ডাকে কোনও মওজ নেই।'

ফিরে তাকালেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে এসিজি। হাসলেন। সাত সকালে তাঁর এই আস্তানায় হুটহাট করে ঢুকে পড়ে এরকম দোআঁশিলা ভাষায় মন্তব্য করতে পারে মাত্র একজনই। ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব। মুখের রেখা কাঠ-কাঠ, চোয়াড়ে, গায়ের রং রোদে পোড়া, চোখ শরীরে বিঁধে যায় যেন, আর পুরুষালী মোটা গোঁফ।

দেখে রঘুপতিকে যতই অপ্রিয় মনে হোক এসিজি ওকে ভীষণ ভালোবাসেন। একসময় এসিজির ছাত্র ছিল ও। কথাবার্তায় রুক্ষ হলে কী হবে, মনটা বড় ভালো। আর কাজ-পাগল। মনে পড়ে, একবার একটা নির্বোধ ওকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল। ও হাসতে-হাসতে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে তার ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যার সব কাজই বাঁ-হাতের তার আবার ডাঁয়ে হাতের জরুরত কী?'

খোলা জানলার পাশেই টেবিলে কোকিল-ঘড়ি। ন'টা এখনও বাজেনি। ঘড়ির পাশেই স্টেইনলেস স্টিলের 'মোনালিসা' ফ্লাস্ক। রঘুপতি জানে, ভোরবেলায় উঠেই এসিজি নিজের হাতে ফ্লাস্ক ভরতি কফি করে রাখেন। কারণ, এখানে এখনও পরের হাত বলে কিছু নেই। স্ত্রী মালিনী চলে গেছেন প্রায় এক যুগ আগে। আর একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলারও বিয়ে হয়ে গেছে গত বছর।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে খাতা-পেনসিল গুছিয়ে রাখলেন তার পাশে। হাসতে-হাসতে বললেন, 'বোসো, রঘুপতি। নক্‌লি চিড়িয়ার ডাকে মওজ না থাকলে কী হবে, আমার ফ্লাস্কের কফিতে থাকতে পারে। আজ্‌মাকে দেখো—।'

ছাপা কাপড়ে আবৃত বেতের চেয়ারে বসল রঘুপতি যাদব। গা হেলিয়ে দিল শোয়ার ভঙ্গিতে। হেসে বলল, 'স্যার, পাখিতে কী মজা পান বুঝি না। মাঝে-মাঝে ডাক শুনতে ভালো লাগে। তা বলে দিনভর কিচিরমিচির?'

এসিজি কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলেন রঘুপতিকে। তারপর ঘরের মেঝেতে সাজিয়ে রাখা বইয়ের কয়েকটা স্তূপকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে আর-একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

সাদা পাজামা টেনে ঠিক করে বললেন, 'তুমিই বা চোর-ডাকাত-খুনে-বদমাসের মধ্যে কী মজা পাও বুঝি না। পাখিরা তার চেয়ে অনেক ভালো।'

রঘুপতি যাদব কফিতে চুমুক দিল কয়েকবার। তারপর সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'গুপ্তাসাব, আপনার জরুরি কাজে ডিসটার্ব করলাম....'

এসিজি ঝুঁকে পড়ে রঘুপতির কাঁধ চাপড়ে দিলেন আলতো করে। বললেন, 'যা শুরু করেছি তা এক-আধ দিন পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। অন্তত দু-বছর লাগবে।'

'কী কাজ?' রঘুপতির কৌতূহল হল। কপালে ভাঁজ পড়ে।

এসিজি মাথার চুল টানলেন একবার। তারপর ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'বার্ড কমিউনিকেশন। পাখিদের ভাষা। কোন-কোন পাখি কীরকম ভাষায় কথা বলে তাই বোঝার চেষ্টা করছি। যে-টেপটা বাজাচ্ছিলাম, সেটা গত সপ্তাহে সুন্দরবনের জঙ্গলে টেপ করা। এর মধ্যে রাডি কিংফিশারের আওয়াজ শুনতে পেলে ?'

'রাডি কিংফিশার ?' রঘুপতি জলদি চুমুক দিয়ে ফেলে কফির কাপে। তারপরই 'উঃ' করে ওঠে। একটু সময় নিয়ে ও বলল, 'স্যার, আমি এদিকে এক ব্লাডি কিংফিশারকে নিয়ে ফেঁসেছি। গত কয়েক বছর ধরে প্রীতম দাস চৌধুরি বহু মছলি পাকড়েছে। কিন্তু আমরা ওকে ফাঁদে ফেলতে পারিনি। মছলি পাকড়েছে আর শটকেছে। সোজা ন' দো গিয়ারা।'

এসিজি বাধা দিলেন ঃ 'রঘুপতি, জিভে আগল দাও। বোঝাই যাচ্ছে তুমি ডিসটার্বড্ না হলে আমাকে ডিসটার্ব করতে আসতে না। তা এই প্রীতম দাস চৌধুরি লোকটা করেছে কী ? খুন করেছে ?'

রঘুপতি যাদবের কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাশের ছোট্ট টেবিলে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, 'এতদিন শুধু ওর খুন করাটাই বাকি ছিল। পরশু সেটা সেরে ফেলেছে।' একটু থেমে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, খুনটা দাস চৌধুরিই করেছে। কিন্তু কী করে করেছে ধরতে পারছি না। লোকটা গহেরা পানিকা মছলি, গুপ্তাসাব।'

রঘুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত ওর অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তাটা অনুভব করতে পারছিলেন। ছেলেটা সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ওর চাকরিকে। লালবাজার ওর কাছে মন্দির। আর পুলিশী উর্দি ওর গর্ব। কিন্তু প্রীতম দাস চৌধুরি ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

এসিজি কাশলেন। মাথার এক গোছা চুল ধরে টানলেন বারদুয়েক। তারপর বললেন, 'প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থেকো না, রঘুপতি। আমি এখনও মরে যাইনি। আই নো হাউ টু ক্যাচ আ রেয়ার বার্ড।' হাসলেন এসিজি, বললেন, 'একটা কথা তোমাকে তো সবসময় বলি। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের ছিটেফোঁটা গুণও নেই আমার মধ্যে। তবে আমি, সাধারণ একজন গোয়েন্দা, মোটামুটি-ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। সুতরাং, মনে হয় প্রীতম দাস চৌধুরির ধাঁধা আমি সল্‌ভ করতে পারব।'

কোকিল-ঘড়িতে সুরেলা শব্দে ন'টা বাজল।

রঘুপতি দেখল এসিজির দিকে। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে বৃদ্ধের মাথায়। সাদা চুলের গুচ্ছ চকচক করছে রুপোর মতো। পাখি-পাগল এই মানুষটা একসময়ে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করত। এখন পাখি আর অপরাধী নিয়ে গবেষণা করে। বলে, বার্ড ওয়াচিং আর ম্যান ওয়াচিং-এ নাকি অনেকটাই মিল। ঈশ্বর জানেন!

রঘুপতি একটু সময় নিয়ে মনে-মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল। তারপর শুরু করল : 'দাসচৌধুরির নাম আপনি হয়তো শোনেননি. তবে লোকটা বহত সাল ধরেই দু'নম্বরি কারবার চালাচ্ছে। যেমন, প্রথমে করত কালোয়ারি, চোরাই মাল-টাল খরিদ করত। তারপর ধরমতল্লায় একটা হোটেল খুলে বসল। ছোট কিন্তু টিপটপ হোটেল। নাম, মুসাফির। তো হোটেল খোলার পর লোকটা স্মাগলিং-এর বেওসায় নেমে পড়ল। তারপর শুনেছি গত বছর থেকে নাকি ড্রাগের লাইনে পা দিয়েছে।'

একটু ফাঁক পেতেই অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাত তুললেন, বললেন,

'রঘুপতি, ডিয়ারবয়, তোমার রাজধানী এক্সপ্রেসের গতি কিছুটা কমাতে পারলে ভালো হয়। তোমাদের রেকর্ডে দাস চৌধুরির নাম নেই ?'

রঘুপতি বলল, 'আছে। তবে সে সবই ছোটামোটা লাফড়া। সব ক'টা কেসেই জামিনে ছুট হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রীতম পয়সাওয়ালা রইস—সবসময় এক নম্বর ল'ইয়ার দাঁড় করায়।'

এসিজি চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন কফির ফ্লাস্কের দিকে। নিজের জন্য এক কাপ ঢাললেন। রঘুপতির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করতে ও মাথা নাড়াল। বিরক্তভাবে বলল, 'স্যার, আমি দু'রাত্তির ধরে ঘুমোতে পারছি না। আমার জান জ্বলে যাচ্ছে। প্রীতমকে ধরার এটাই সুন্হরি মওকা। কিন্তু যদি এবারেও পিছলে বেরিয়ে যায় তা হলে—।'

'টেক ইট ইজি, রঘুপতি,' কফির কাপ হাতে নিয়ে এসিজি ফিরে এলেন। চেয়ারে গুছিয়ে বসে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মাথা গরম না করে গলপটা ধীরে-ধীরে বলো। গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাও, বলো।'

'মুসাফিরের চারতলাটা প্রীতম নিজে ব্যবহার করে। তিনটে ঘর আছে সেখানে। গত পরশু সকালে ওর দুই দোস্ত মুকেশ আর সুদেশ তেওয়ারি হোটেলে আসে। মুকেশ আর সুদেশ দু-ভাই। তবে ওরা দুজনেই প্রীতমের বিজনেস পার্টনার। কীসের বিজনেস তা বলতে পারব না। তবে পাচ-ছ'রকম তো হবেই। তার মধ্যে কয়েকটা ন্যাচারালি কালা ধান্দা।'

এসিজি চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিলেন। হাতের কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। হঠাৎই চোখ খুলে বললেন, 'লোকগুলোর ছবি এনেছ তুমি ?'

পাশেই একটা খালি চেয়ারে একটা মোটা ফোল্ডার পড়ে ছিল।

সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রঘুপতি। এসিজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'শুধু ফটো কেন, এখানে ওই তিনজনের পুরো দাস্তান পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া স্পটের নানান ফটোগ্রাফ আর রিপোর্টও আছে।'

এসিজি ফোল্ডারটা নিলেন। তাঁর চোখ সজাগ হল। শীর্ণ শরীরর ঋজু হল। কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন। তারপর পাখি-দেখা তীক্ষ্ন চোখে ফোল্ডারের কাগজপত্র উলটেপালটে দেখতে শুরু করলেন। তাঁর চশমার কাচ চকচক করছিল।

প্রথমেই প্রীতম দাস চৌধুরির ছবি। বছর পঁয়তাল্লিশের মোটাসোটা মানুষ। গায়ের রঙ কালো। কপাল মাথার দিকে উঠে গেছে অনেকটা। চোখ দুটো কুতকুতে—শয়তানের নজর যেন তাতে। চোখের নীচে চর্বির থাক। বেপরোয়া অত্যাচারের চিহ্ন। গলায় সোনার সরু চেন।

ছবির নীচেই রয়েছে প্রীতমের দাস্তান বা জীবনী। সেটা খুঁটিয়ে পড়লেন এসিজি। তারপর পাতা ওলটালেন।

মুকেশ তেওয়ারি। বয়েস বোধহয় পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে। রোগা ফরসা চেহারা। চোখেমুখে ভীষণ পরিশ্রমের ছাপ। আর দৃষ্টিতে যেন একটা চাপা জেদ ফুটে বেরোচ্ছে।

ফটোর ওপরে একটা সিলমোহরের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। সেটার কথা রঘুপতিকে জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'মুকেশ তেওয়ারিই মারা গেছে গত পরশু। পাতা ওলটালেই ওর ডেডবডির ফটো দেখতে পাবেন। এই তসবিরটা আমরা ওর পাসপোর্ট থেকে কপি করেছি।'

এরপর সুদেশ তেওয়ারি। বয়েসে দাদার চেয়ে অন্তত বছর আট-দশের ছোট। চুল খাটো করে ছাঁটা। সরু গোঁফ। চোয়ালের রেখা উদ্ধত। চোখের নজর দাদার মতোই।

ফটো দেখা শেষ করে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বাকি রিপোর্টগুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎই চোখ তুলে রঘুপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাঃ, তোমার ধৈর্য দেখছি নিতান্ত পলকা।'

রঘুপতি যাদব উসখুস করছিল। একটু অস্বস্তি পেল।

সেটা লক্ষ করে এসিজি বললেন, 'ও কে. রঘুপতি, তুমি গল্পটা বলে যাও। আমার কান মনোযোগ দিয়ে শুনছে।'

রঘুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আগের চেয়ে অনেক নরম গলায় এবং ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলঃ 'খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি বিজনেসের ব্যাপারে মাথা বলতে ছিল মুকেশ তেওয়ারিরই। সুদেশ প্রীতমের প্রায় সমান উমরের হওয়ার জন্যে দুজনে বেশির-ভাগ সময়টাই ফুর্তিফার্তা করে কাটিয়ে দিত। এবারে বিজনেসের কোনও কনট্র্যাক্ট নিয়ে বোধহয় লাফড়া হয়েছিল। তাতে হোটেলের চাকর-বেয়ারা বহত হল্লাগুল্লা শুনেছে। মুকেশ তেওয়ারিই চিৎকার চেঁচামেচি করছিল বেশি। মাঝে-মধ্যে প্রীতম দাস চৌধুরি ওর গুস্সা ঠাণ্ডা করার কোশিশ করছিল—।'

এসিজি ফোল্ডারের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'ঝগড়াটা হয় সন্ধে সাড়ে ছ'টায়?'

রঘুপতি বুঝল গুপ্তাসাব রিপোর্টটা ধেয়ান দিয়েই পড়ছেন। ও শুধু ঘাড় হেলাল। তারপর বলল, 'সে যাই হোক, মুকেশ তেওয়ারি অনেক মেহনতের পর ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার সময় সে মারা যায়। তখন ওর পাশের ঘরে বসে প্রীতম আর সুদেশ গল্প করছিল, আর ভিডিয়োতে কী একটা সিনেমা দেখছিল। হঠাৎই প্রীতম একটা শব্দ শুনতে পায়—অন্তত স্টেট-মেণ্টে সেরকমই বলেছে। শব্দটা অনেকটা নাকি ধমাকার মতো—এই পটকা-ফটকা যেমন হয়। সুদেশ বলেছে, সে কিছু শুনতে পায়নি। অবশ্য বুঝতেই পারছেন, সে হয়তো ঠিক বহাল তবিয়তে

ছিল না—চোখে রং ধরে গিয়েছিল। তা আওয়াজটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা দুজনে ছুটে যায় পাশের ঘরে। দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু দরজা কেউ খোলে না। তখন প্রীতম চাবির ফুটোয় নজর দিয়ে দেখে। সন্দেশকেও দেখায়। তারপর সন্দেশকে বলে, চাবিটা ভেতর থেকে তালার গর্তে ঢোকানো রয়েছে। ইয়ানি অন্দর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়েছে। তারপর চাবিটা আর কেউ খুলে নেয়নি।'

এসিজি শব্দ করে ফোল্ডার বন্ধ করলেন। রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। তাঁর মুখে,-চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। কপালে চার-পাঁচটা ভাঁজ ফেলে বলে উঠলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর—তারপর—?'

রঘুপতি যাদব গালে হাত ঘষল। ঠোঁট উলটে বলল, 'তারপর আর কী, ধাক্কাধাক্কি করে সন্দেশ যখন দরজা ভাঙতে যাবে তখন প্রীতম ওকে থামায়। একটা দারুণ মতলব দেয়। কোথা থেকে একটা অখবারের পাতা এনে তার অর্ধেকটা দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর একটা কাঠ দিয়ে চাবির ফুটোর ভেতরে খোঁচা দেয়। ভেতরের চাবিটা শব্দ করে পড়ে যায় নীচে। তখন অখবারের পাতাটা টেনে নিতেই চাবিটা বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। সেটা নিয়ে প্রীতম নিজেই দরজার তালা খোলে। তারপর হুড়মুড় করে দু-মক্কেল একসাথ ঢুকে যায় ঘরের ভেতরে।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাসলেন। কফির কাপ নিয়ে চলে গেলেন ফ্লাস্কের কাছে। কফি ঢালতে-ঢালতে শিস দিয়ে উঠলেন। যেন কোনও পাখি ডাকছে। তারপর আবার ফিরে এলেন চেয়ারে, পরপর তিন-চার চুমুক দিলেন কাপে।

এসিজির আচরণ দেখে রঘুপতি যাদব থেমে গিয়েছিল। চোখ বড় করে বলে উঠল, 'স্যার, ম্যায়নে কোই খুশিকি বাত সুনায়া কেয়া?'

'বেশক ইন্সপেক্টরসাব, বেশক। তবে তুমি থেমো না, প্লিজ কন্‌টিনিউ।' এসিজির চোখে চাপা কৌতুক।

রঘুপতি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাম কি লীলা রামহি জানে। তো যাই হোক, ওরা দুজনে ঘরে ঢুকে দ্যাখে মুকেশ তেওয়ারি বিছানার কাছে একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছে। ডাঁয়ে হাথে রিভলবার ঝুলছে। আর বুকের বাঁ দিকে গোলি কি নিশান। খতম। ব্যস্‌। তখন প্রীতম দাস চৌধুরি তার দোস্ত সুদেশকে বলে মুকেশ তেওয়ারি সুইসাইড করেছে। বড়ি আফসোস কি বাত। তাতে সুদেশ তেওয়ারি হঠাৎই খেপে যায়। ও বলে, না. ওর দাদা খুন হয়েছে। তারপর ও ঘরের সব ক'টা দরজা আর খিড়কি ভাল করে দেখে। লেকিন সব অন্দরসে বন্ধ্‌। একদম ছিটকিনি লাগানো, গুপ্তাসাব। অন্য কোনও লোক যে মুকেশকে খুন করে হাতে রিভলবার সাজিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। কামরার দরজা-খিড়কি সব অন্দর থেকে পাক্কা বন্ধ্‌ ছিল। কিন্তু তাতেও সুদেশ তেওয়ারি বুঝতে চায়। ও খালি বলে, আমার বড়াভাইকে কেউ সাজিশ করে খুন করেছে। সুইসাইড না-মুমকিন। ইমপসিব্‌ল।'

রঘুপতি একটু থামল। এসিজি কফি শেষ করে ফেলেছিলেন। কাপটা রেখে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'দাদা খুন হয়েছে বলে সুদেশ তেওয়ারি গোঁ ধরে বসে আছে কেন?'

রঘুপতি হেসে বলল, 'এইখানেই মজা, স্যার। সেদিন বিকেলে মুকেশ তেওয়ারি নাকি ভাইকে বলেছিল, আগামীকাল—অর্থাৎ, গতকাল—বেওসার কীসব হিসেবপত্তর নিয়ে বসবে। আজকাল হিসেবপত্তরে নাকি উলটা-সিধা গড়বড় দেখা যাচ্ছে। এর জন্যে মুকেশ পুরোপুরি প্রীতমকেই দায়ী করেছে। এ ছাড়া দু-ভাইয়ে মিলে কাল সকালে ওদের এক বুড়্‌টি মওসিকে বড়বাজারে দেখতে যাবে প্ল্যান করেছিল। তারপর তো সাড়ে ছ'টায় কাজিয়া। আর

সাড়ে বারোটায় মুকেশ তেওয়ারির খেল খতম। এই সব কারণেই সুদেশ কিছুতেই মানতে পারছে না ওর দাদা খুদকুশি—মানে, সুইসাইড করেছে।'

রঘুপতি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। হাত-পা নেড়েচেড়ে আড়মোড়া ভাঙল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'রিভলবারটা কার?'

রঘুপতি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধকে। বলল, 'কার আবার, মুকেশ তেওয়ারির! রিপোর্টে লেখা আছে।'

'গুলি কি ক্লোজ রেঞ্জ থেকে করা হয়েছিল? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট কী বলছে?'

'ক্লোজ রেঞ্জ। কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু সুদেশ তেওয়ারি হইচই শুরু করে দিয়েছে। আর প্রীতম দাস চৌধুরির দাঁত বের করা হাসি আমি সইতে পারছি না। ষোলো আনা মোটিভ রয়েছে, কিন্তু কোনও সবুত নেই।' বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতে ঘুষি মারল রঘুপতি যাদব। বলল, 'শয়তানটাকে অন্দর করতে পারলে মওজ করে পালিশ লাগাব। কিন্তু…।'

'আঃ, রঘুপতি।' অশোকচন্দ্র স্নেহের সুরে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠান্ডা হয়ে বোসো দেখি। তোমাকে আমি প্রমাণ-টমান সব জোগাড় করার মতলব বাতলে দিচ্ছি।'

রঘুপতি যাদব চেয়ারে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু তার মুখে অসন্তোষের ছোঁওয়া লেগে রইল।

এসিজি বললেন, 'সুদেশ কি গুলির আওয়াজ শুনেছিল?'

'ও তো বলছে, না শোনেনি।'

'হোটেলের আর কেউ কিছু শুনেছে?'

একটু ভেবে রঘুপতি বলল, 'সুলেমান নামে এক বেয়ারা কসম খেয়ে বলছে রাত বারোটা নাগাদ ও একটা ধমাকার শব্দ শুনেছে।

কিন্তু সন্ধের পর সুলেমান একটু-আধটু নেশা করে। তো কে জানে আসলি নকশা কী!'

এসিজি নড়েচড়ে বসলেন। সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন দু-বার। বললেন, 'রঘুপতি তুমি ঠিকই বলেছ। মুকেশ তেওয়ারি খুন হয়েছে—আর, ওকে খুন করেছে প্রীতম দাস চৌধুরি।'

রঘুপতি যাদব শিরদাঁড়া টানটান করে বসল। জিগ্যেস করল, 'লেকিন ক্যায়সে, স্যার? দরজা-খিড়কি সব তো অন্দরসে বন্ধ্ ছিল!'

এসিজি হাসলেন: 'সেটাই তো বন্ধ ঘরের রহস্যের মজা, রঘুপতি। তবে এটুকু তোমাকে বলে রাখি, মুকেশ তেওয়ারিকে গুলি করা হয়েছে বারোটা নাগাদ। তোমার সুলেমানের কথাই বোধহয় ঠিক। খোঁজ করে দেখো, ওই সময়ে প্রীতম দাস চৌধুরি বন্ধুবর সুদেশকে ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়েছিল কি না। তা ছাড়া আমার ধারণা, গুলি করার সময়ে সে হয়তো রিভলবারের মুখ চাদর-টাদর কিছু চাপা দিয়ে থাকবে। তাতে গুলির আওয়াজটা অনেক ভোঁতা শোনাবে। তোমার কাজ হবে সেই দাগী চাদরটা উদ্ধার করা। হয় ওটা হোটেলের স্টোর রুমে আছে, নইলে প্রীতম গুঁজে দিয়েছে কোনও উনুনে।'

রঘুপতি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'খুন করার পরে ও কী করল তাই বলুন—।'

'বলছি।' এসিজি একটু দম নিয়ে বললেন, 'ঘরের জানলাগুলো ঝটপট বন্ধ করে দিল প্রীতম। তারপর দরজার ভেতর দিকের চাবির গর্তে এমন একটা চাবি ঢুকিয়ে দিল যার মাথাটাই কাটা। অর্থাৎ, তালা খোলার জন্যে চাবির যে-অংশটা সবচেয়ে জরুরি সেইটুকুই কেটে বাদ দেওয়া। এই অকেজো চাবিটা দরজার ভেতর দিকে লাগিয়ে প্রীতম বাইরে এসে দরজা টেনে দরজা লক করে দেয় বাইরে থেকেই। হোটেলের মালিক হওয়ার সুবাদে প্রীতমের কাছে

মুকেশের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয়ই ছিল।

'সে যাই হোক, জলদি কাজ সেরে প্রীতম ফিরে এল সুদেশের কাছে। এসে এতক্ষণ গরহাজির থাকার জন্যে যা হোক একটা বাহানা শোনাল। তারপর সাড়ে বারোটা নাগাদ মিথ্যে করে বলল যে, সে একটা—তোমার ভাষায়, ধমাকার শব্দ শুনতে পেয়েছে। তখন সে জোর করেই সুদেশকে সঙ্গে নিয়ে মুকেশের ঘরের দরজায় হাজির হয়। ওকে সাক্ষী মানার জন্যে ভেতর দিকে লাগানো অকেজো চাবিটা ওকে দেখায়। এমনিতে ওরকম ভাবে তালায় চাবি ঢোকানো থাকলে বাইরে থেকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খোলা মুশকিল। তাই প্রীতম খবরের কাগজ পেতে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে অত সব কাণ্ড করেছে।'

এসিজি থামতেই রঘুপতি বলল, 'কিন্তু যে-চাবিটা অখবারের পাতা দিয়ে প্রীতম বাইরে বের করে নিয়ে এল সেটা তো ফালতু! তা হলে ওই চাবি দিয়ে দরজা খুলে গেল কী করে, স্যার?'

হাসলেন এসিজি। বললেন, 'একে বাংলায় বলে হাতসাফাই, রঘুপতি। সুদেশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে অত কষ্ট করে বের করে আনা অকেজো চাবিটা বোধহয় আসল চাবির সঙ্গে পালটে নিয়েছিল প্রীতম। আসল চাবিটা ওর পকেটেই ছিল হয়তো। ব্যস, তারপর আর কী!'

রঘুপতি উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে ফোল্ডারটা তুলে নিল টেবিল থেকে।

অশোকচন্দ্র গুপ্তও উঠে দাঁড়ালেন। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'রঘুপতি, এবারে কী-কী জিনিস খুঁজে বের করতে হবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তার মধ্যে আসল হচ্ছে ওই মাথা কাটা চাবিটা। আর খোঁজ করে দ্যাখো, কোনও চাবিওয়ালা সেইদিন সন্ধেবেলা "মুসাফির" হোটেলে এসেছিল কি না। অবশ্য চাবি কাটাকাটির কাজটা প্রীতম দাস চৌধুরি নিজেও করে থাকতে

পারে। সাড়ে ছ'টা থেকে বারোটা—অন্তত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় পেয়েছিল লোকটা।'

'থ্যাংক য়ু, স্যার,' বলে বড়-বড় পা ফেলে চলে যাচ্ছিল রঘুপতি, ওকে থামালেন এসিজি।

'একটা কথা, রঘুপতি। আমি তো শুধু থিয়োরি বাতলে দিলাম। বাস্তবে সেটা কতটা মিলবে জানি না। কে জানে, প্রীতম দাস চৌধুরি হয়তো সত্যিই মুকেশ তেওয়ারিকে খুন করেনি…।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'সে ভার আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। কালই আপনাকে ফোন করে থিয়োরির রেজাল্ট জানিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। লেকিন, গুপ্তাসাব, কী করে আপনি এই থিয়োরির আইডিয়া পেলেন? ইট ইজ একসিলেন্ট।'

অশোকচন্দ্র চুলের গোছায় টান মারলেন। হেসে বললেন, 'জন ডিকসন কার, রঘুপতি, জন ডিকসন কার। এই ভদ্রলোক জন ডিকসন কার আর কার্টার ডিকসন, এই দুটো নামে সারাটা জীবন শুধু বন্ধ ঘরের রহস্য আর অসম্ভব সমস্যা নিয়ে কিতাব লিখে গেছেন। সুতরাং, যখনই আমি কোনও ক্লোজড্ রুম প্রবলেম পাই তখনই জন ডিকসন কারের মতো করে ভাবতে চেষ্টা করি। তবে সব সময় যে পারি তা নয়…।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'আপনাকে বিনয় জানায় না। জন ডিকসন কারের চেয়েও আপনি জাদা অকলমন্দ। এগেইন আ বিগ থ্যাংক্স, স্যার। গুড বাই।'

রঘুপতি যাদব চলে গেল হনহনিয়ে। অশোকচন্দ্র আবার টেপ রেকর্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপ চালু করলেন। নাম-না-জানা পাখিরা আবার মিষ্টি সুরে ডাকতে শুরু করল। এসিজি তখন জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখছিলেন।

ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটটা দেখছিলেন।

নোটটা ভারি অদ্ভুত। আর পাঁচটা নোটের সঙ্গে বিচিত্র দুটো তফাত।

প্রথমত, নোটের যে-দিকে 50 সংখ্যাটা ইংরেজিতে লেখা রয়েছে তার ডান পাশে অশোকস্তম্ভের নীচে 'সত্যমেব জয়তে' কথাটা লেখা নেই। আর দ্বিতীয় আশ্চর্য হল, নোটটার উল্টোপিঠে পার্লামেন্ট ভবনের যে-ছবি আছে, তার ছাদে শুধু পতাকাদণ্ডটি দাঁড় করানো রয়েছে—জাতীয় পতাকা উধাও।

একটু দূরে দাঁড়ানো বছর পঁয়তাল্লিশের বেঁটে-খাটো চেহারার স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক অশোকচন্দ্র গুপ্তের কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'সাধারণত পঞ্চাশ টাকার যেসব নোট বাজারে পাওয়া যায় তাতে "সত্যমেব জয়তে" কথাটাও পাবেন, আর উল্টোদিকে পার্লামেন্ট ভবনের মাথায় ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে ফ্ল্যাগটাও দেখতে পাবেন।'

অথচ এই নোটটার ফ্ল্যাগ উধাও! তা ছাড়া নোটটায় অশোক-স্তম্ভের দিকটার রঙ কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি—নোটটাকে তুলে ধরলেন ঘরের খোলা জানলার দিকে। আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওটাকে।

এইবার কথা বলল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব, 'না, স্যার, যা ভাবছেন তা নয়। এই নোটটা জাল নয়—একেবারে অসলি।'

রঘুপতি যাদব একসময়ে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এসিজির ছাত্র ছিল। এসিজি তখন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন।

তারপর জীবনের নানা পথ ঘুরে রঘুপতি যাদব কীভাবে যেন লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াডে ইন্সপেক্টর হয়ে গেছে। আর অশোকচন্দ্র গুপ্ত বয়সে পঁয়ষট্টির ঘর পেরিয়েও তাঁর গোয়েন্দাগিরির শখ ছাড়তে পারেননি।

এসিজি নোটের নম্বরটা দেখলেন ঃ ২ সিবি ৫৪৭৫৪১ গভর্নরের জায়গায় ইংরেজি আর হিন্দিতে সই করেছেন কে. আর. পুরি।

রঘুপতি ঠিকই বলেছে, নোটটা জালনোট নয়। অথচ কী বিচিত্র!

'জয়দেববাবু...' মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন অশোকচন্দ্র, বললেন, 'এটাকে কি রেয়ার নোট বলা যায়?'

ভদ্রলোকের নাম জয়দেব সরকার। থাকেন টালাপার্কের কাছে। কাগজের ব্যবসা করেন। তবে খুব অল্প বয়েস থেকেই তাঁর রেয়ার কয়েন আর নোটের দিকে ঝোঁক। এ-সম্পর্কে অনেক জানেন। অন্তত রঘুপতি যাদব সেরকমই জানিয়েছে এসিজিকে।

আর যদি তা সত্যি না হত, তা হলে সকাল ন'টায় জয়দেববাবুকে বাড়ি থেকে তুলে এসিজির বাড়িতে নিশ্চয়ই সে নিয়ে আসত না।

জয়দেব সরকার সামান্য হেসে বললেন, 'তা যৎসামান্য রেয়ার বইকি। এ নোট আপনি সহজে খুঁজে পাবেন না।'

এসিজি নোটটা জয়দেব সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিভে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলেন। ফ্ল্যাটের খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-পাঁচ সেকেন্ড। তারপর রঘুপতিকে লক্ষ করে বললেন, 'মাই ডিয়ার রঘুপতি, জয়দেববাবুর হেল্প পেলে আর কোনও চিন্তা নেই। তোমার মার্ডারার একেবারে সোজা ক্যাচ কট কট।'

'এসিজি, প্লিজ, মজাক করবেন না। বলরাম চৌধুরির মার্ডার কেস আর এক উইকের মধ্যে সল্‌ভ করতে না পারলে আমার

পজিশন ঢিলে হয়ে যাবে।'

এসিজি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটে জম্পেশ করে টান দিয়ে জয়দেব সরকারকে বললেন, 'আপনারা বসুন—একটু কফি খান।' তারপর নিজেই এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

রঘুপতি এসিজিকে কমদিন চেনে না। প্রাক্তন স্যারের শ্যামবাজারের এই ফ্ল্যাটে সে মোটেই নতুন নয়। এসিজির স্ত্রী কিডনির সমস্যায় কাবু হয়ে আকাশের তারা হয়ে গেছেন প্রায় দশ বছর। আর একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে এই সাদা চুল বৃদ্ধ মানুষটিই এই ফ্ল্যাটে একা-একা থাকেন। দিনরাত মেতে থাকেন পাখি আর পাখির ডাকের রহস্য নিয়ে। এ ছাড়া রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনীর পোকা। সেই কবে থেকে ওই রসে ডুব দিয়ে চুপটি করে বসে আছেন—এখনও মাথা তোলেননি।

ফাইফরমাসের একটা বাচ্চা ছেলে বিশু আর রান্নার একজন ঠিকে লোক নিয়ে দিব্যি আছেন এসিজি। মাঝে-মাঝে স্যারের এই জীবনকে হিংসে করে রঘুপতি যাদব। পড়াশোনা, সিগারেট, আর কফির নেশায় বেশ মেতে আছেন রোগা লম্বা মানুষটি।

রঘুপতি যা ভেবেছিল তাই। কফির ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ হাতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এসিজি। রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, এই নাও, আমাদের জন্যে কফি ঢালো—আর তুমিও নাও।'

তিনটে কাপ আর ফ্লাস্ক পড়ার টেবিলের কাছাকাছি একটা টি-টেবিলে রেখে এতক্ষণ ধরে ঠোঁটে ঝোলানো জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিলেন এসিজি। একটা চেয়ার টেনে বসলেন ওদের কাছাকাছি। তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'রঘুপতি, কাল তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে আমার মাথা ঘুরছে। কেন জানো?

তোমার যে-কয়েকটা স্পেশাল কথা আমার কানে লেগে আছে সেগুলো এইরকম ঃ ফেমাস বিজনেসম্যান বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন, ওঁর বড় ছেলে বিশাল পলিটিক্যাল লিডার, লক্ষ কোটি টাকা দামের রেয়ার কয়েন, আর সবার ওপরে ক্লোজড রুম প্রবলেম —বন্ধ ঘরের রহস্য।' দরাজ গলায় হাসলেন অশোকচন্দ্র ঃ 'বলো, মাথা ঘুরবে কি না?'

রঘুপতি যাদব হেসে বলল, 'স্যার, এতেই থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেল! তো আমার হালত কী রকম একবার ভেবে দেখুন—।'

এসিজি কথায়-কথায় প্রায়ই নিজেকে থিঙ্কিং মেশিন বলেন। আর ব্যাপারটা বোঝাতে আঙুল দিয়ে সাদা চুলে ঢাকা মাথায় টোকা মারেন।

রঘুপতি কফি ঢালার কাজ শেষ করতেই একটা কাপ তুলে নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে এসিজি বললেন, 'রঘুপতি, জয়দেববাবুকে নিয়ে আমরা স্পটে যাওয়ার আগে তুমি ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে আমাদের শোনাবে? অবশ্য আজকের আনন্দবাজার আর টেলিগ্রাফ আমি পড়েছি। জয়দেববাবুও খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

জয়দেব সরকার শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। এসিজির প্রশ্নে তাড়াহুড়ো করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়েছি। ওই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা ছিল বলেই একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়েছি।'

রঘুপতি ঝটপট চুমুক দিয়ে কফির কাপ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ করে দিল। কাঁচা-পাকা গোঁফে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল।

'আজ শুক্রবার। বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন সোমবার —দিনদুপুরে। উনি চৌধুরি ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক ছিলেন। ওঁর ব্যবসার অ্যানুয়াল টার্নওভার প্রায় তিরিশ কোটি টাকা। ব্যবসা

ছাড়া ভদ্রলোকের তেমন কোনও শখ ছিল না। লেকিন রিসেন্টলি নাকি পুরনো নোট আর কয়েনের দিকে ঝোঁক গিয়েছিল।

'বলরাম চৌধুরির বয়েস করিব সত্তর-বাহাত্তর, বিপত্নীক, তবে জানদার আদমি ছিলেন। ওঁর দু-ছেলে। বড়জন তো মোটামুটি নামী পলিটিক্যাল লিডার। লাস্ট ইলেকশানে জেতার পর অল্পের জন্যে মিনিস্টার হতে পারেননি। নাম শুনলে আপনি হয়তো চিনতে পারবেন, স্যার। সতীনাথ চৌধুরি।'

এসিজি মন দিয়ে রঘুপতি যাদবের কথা শুনছিলেন আর মাঝে-মাঝে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছিলেন। প্রাক্তন ছাত্রের কথায় হাত বাড়ালেন নিজের বই-আর-কাগজপত্র-ছড়ানো অগোছালো টেবিলের দিকে। সেখানে একটা রুবিক কিউব পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে লাল-নীল-হলদে-সবুজ খুদে কিউবগুলোকে কয়েকটা মোচড় দিলেন। রুবিক কিউবের নকশা বদলে গেল। ওটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে ঠোঁটের সিগারেট নামিয়ে টি-টেবিলে রাখা একটা অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন। তারপর হেসে বললেন, 'সরি, রঘুপতি। আমার কাছে যেসব ইনফরমেশান জরুরি নয় সেগুলো আমি মাথায় রাখি না। বলরাম চৌধুরি, চৌধুরি ইন্ডাস্ট্রিজ, সতীনাথ চৌধুরি —এসব নামের চেয়ে কোনান ডয়েলের মিস্টার শার্লক হোম্‌স, কিংবা রুথ রেন্ডেলের ইন্সপেক্টর ওয়েক্সফোর্ড আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট। যাকগে, তুমি বলে যাও—'

জয়দেব সরকার এই দুটি মানুষকে লক্ষ করছিলেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনতে তাঁর খারাপ লাগছিল না। একজন বন্ধুর মারফত ইন্সপেক্টর যাদব গতকাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। অনেক আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, কোনও ভয় নেই। একটা মার্ডারের ব্যাপারে রেয়ার কয়েনের বিষয়ে কিছু মতামত দরকার। তাতে তদন্তের কাজে অনেকটাই সাহায্য হবে।

তাই আজকের দিনটা জয়দেব সরকার ছুটি নিয়েছেন ব্যবসা

থেকে। খুব কম বয়েস থেকে ব্যবসায় ঢুকেছেন, ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন, বড় করেছেন। সেই সঙ্গে বয়েসটাও একটু-একটু করে বেড়েছে। বিয়ে-থা করা হয়ে ওঠেনি। তবে রেয়ার কয়েন আর নোটের নেশায় ডুবে গেছেন। আর নেশার টানেই আজ এই অদ্ভুত বৃদ্ধের বাড়িতে ছুটে এসেছেন ইন্সপেক্টর যাদবের সঙ্গে। আসার সময় পকেটে করে বেশ কিছু জিনিসও নিয়ে এসেছেন—যদি কোনও কারণে দরকার পড়ে।

রঘুপতি যাদব ঠোঁট উলটে হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যার মানে অনেকটা 'রামজীর লীলা রামজীই জানে' গোছের। তারপর আবার বলতে শুরু করল।

'বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে, ওঁর সল্ট লেকের বাড়িতে, একতলায় নিজের বেডরুমে। ওঁর মুখের ওপরে বালিশ চেপে ধরেছিল মার্ডারার। বালিশে থোড়াসা ব্লাডও লেগেছে। কিন্তু খুনির সঙ্গে সেরকম লড়াই হয়নি। মানে, বাড়ির কেউ কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। তবে বাড়িটা বেশ বড়—সঙ্গে বাগানও আছে। তা ছাড়া বাড়ির সবাই তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের ঘুম লাগিয়েছে।'

'বাড়িতে তখন কে-কে ছিল?' প্রশ্নটা করে শেষ-হয়ে-যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন একেনবাবু।

'প্রায় সবাই। কারণ, বলরামবাবুর দু-ছেলের কেউই নোকরি করেন না। বড়জনের কথা তো একটু আগেই বলেছি। আর ছোটজন, মণিনাথ চৌধুরী, গানবাজনা-পাগল মানুষ। বাবার ব্যবসায় দুজনের কেউই বসেন না। তবে দুজনেই ফ্যামিলি ম্যান। বড়ছেলের একটি ছেলে আছে—কুন্তল—ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওর পুজোর হলিডে চলছে। তা সেদিন বাড়িতে সবাই ছিল। মণিনাথ গানবাজনা করছিলেন। ওঁর এক গানের ওস্তাদ সেদিন ছিল ওঁর সঙ্গে। ওস্তাদের নাম অশোক জানা। রোগা, কালো, পান-চিবোনো

চেহারা। ড্রেস দেখে গানের ওস্তাদ বলে মনে হলেও চেহারা দেখে সন্দেহ হয়। মনে হয়, চ্যাংড়া, লাফাঙ্গা, মাওয়ালি। মাঝে-মাঝেই থেকে যায় চৌধুরিদের বাড়িতে।

'বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওদের বাড়ির ঠিকে কাজের বউ সুখীর মা বাগিচায় রোদে ছড়ানো জামাকাপড় তুলছিল। তখনই সে জানলা দিয়ে দেখতে পায় বড়বাবু কেমন পিকিউলিয়ার স্টাইলে বিস্তরায় শুয়ে আছেন। সুখীর মা গিয়ে চেঁচামেচি করতে সবাই এসে দরওয়াজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। এই হচ্ছে ব্যাপার।'

কথা থামিয়ে কিছু একটা শোনার প্রত্যাশায় রঘুপতি স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বলরামবাবুর ঘরের জানলায় গ্রিল বসানো আছে নিশ্চয়ই?'

রঘুপতি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতে চাইল। তারপর ঃ 'সেইজন্যেই তো ক্লোজড রুম প্রবলেম। আর সতীনাথ চৌধুরি ভীষণ পলিটিক্যাল প্রেসার তৈরি করেছেন। তাই তো লালবাজারকে নাক গলাতে হয়েছে। এখন আপনি যা করার করুন। আই ওয়ান্ট দ্য ব্লাডি মার্ডারার।'

রঘুপতি কখনওই খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল না। কিন্তু ভীষণ সৎ আর পরিশ্রমী। তাই এসিজি বরাবরই ওকে পছন্দ করতেন, এখনও করেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি একটা অসহায় ভাব খুঁজে পেলেন। ওর মুখের বসন্তের দাগ কিংবা ছোট করে ছাঁটা চুল সেই ভাব লুকোতে পারেনি।

'আর রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা?' এতক্ষণ চুপ করে শোনার পর জয়দেব সরকার আমতা-আমতা করে প্রশ্ন করলেন। জানলা দিয়ে আসা আলো ওঁর কপালের ডান দিকে হাইলাইট তৈরি করেছে।

রঘুপতি অস্পষ্ট একটা শব্দ করে তারপর বলল, ‘ওটা স্পটে গেলেই বুঝতে পারবেন। বডি রিমুভ করে ঘরটা লক করে রাখা হয়েছিল। ঘরের সব জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। আমি চাবি নিয়ে এসেছি। আর লোকাল থানাকেও ইনফর্ম করা আছে যে, আমরা স্পটে আজ সকলে যাব। কিঁউ, গুপ্তাসব, অব চলেঁ?’ শেষ প্রশ্নটা চোখ বুজে সিগারেটে টান দেওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা মানুষটিকে লক্ষ্য করে।

চোখ খুললেন এসিজি। বললেন, ‘চলো, যাওয়া যাক। ব্যাপারটা একটু-একটু বোঝা গেল।’

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে-উঠতে অশোকচন্দ্র বললেন, ‘রঘুপতি, একটা ব্যাপার কেমন মজার দ্যাখো। যে-ঘরে ওরা সবাই গায়ের জোরে দরজা ভেঙে ঢুকেছে, সেই ঘর থেকে খুনী পালিয়েছে বুদ্ধির জোরে।’ হাসলেন বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন।

রঘুপতি পালটা হেসে ডান হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বলল, ‘এখন তো আমার গায়ের জোর আর আপনার বুদ্ধির জোর—দুটো নিয়েই আমরা যাচ্ছি। অব দেখ্‌না হ্যায় জোর কিতনা বাজু-এ কাতিল মে হ্যায়।’

প্রাক্তন ছাত্রের কথা শুনে প্রাক্তন স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর সেই আচমকা হাসিতে তাঁর ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ে গেল—তিনি চেষ্টা করেও সেটা সামলাতে পারলেন না।

সল্টলেক জায়গাটা কলকাতার কত কাছে, অথচ কত দূরের বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের যানজট, গাড়ির হর্নের তীব্র শব্দ, কালো ধোঁয়া, ভিড়, চিৎকার, কিছুই এখানে নেই। তা ছাড়া বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই কেমন চোখ জুড়িয়ে যায়।

বলরাম চৌধুরির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কথাটাই মনে হচ্ছিল এসিজি-র।

প্রকাণ্ড মাপের বাড়ি। নাম 'চৌধুরি ভিলা'। সাদা আর বাদামী রঙ। বড় লোহার গেটের ওপাশে বড় উঠোন। তার একপাশে সারি-সারি টবে ফুলগাছ। আর বাঁদিকে বেশ বড় মাপের বাগান।

বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ফরসা মতন একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল বাগানের পাশ দিয়ে। তার নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় গামছা দিয়ে তৈরি পাগড়ি। গায়ে মেরুন রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে সরু পাজামা, আর কোমরে বেল্ট।

বাচ্চাটা 'সাবু! সাবু!' বলে চিৎকার করছিল। এসিজিদের দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠল, 'সাবু! জলদি এসো। দেখে যাও কারা এসেছে।'

রঘুপতি যাদব অশোকচন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'কুন্তল।'

এসিজি ইশারায় ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

কুন্তল বেশ স্মার্টভাবে উত্তর দিল, 'এখন আমি চাচা চৌধুরি।'

এসিজি অবাক হয়ে বললেন, 'চাচা চৌধুরি মানে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল কুন্তল: 'এ মা, চাচা চৌধুরির নাম জানে না! চাচা চৌধুরির কমিক্স বই পড়োনি?'

এসিজির অতিকষ্টে মনে পড়ল বুক-ম্যাগাজিনের স্টলে এই নামে কমিক্স দেখেছেন, এবং সেই 'চৌধুরি' বানানে কোনও উ-কার ছিল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।' সাত-তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন তিনি।

'জানো, চাচা চৌধুরির বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর!'

এসিজি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাগানের দিক থেকে ছুটে এল আর-একটি ছেলে। বয়েস ষোলো-সতেরো। ময়লা রঙ। পরনে শুধু একটা হাফ প্যান্ট। পাঁজরা গোনা যাচ্ছে।

'হুকুম করুন, চাচা চৌধুরি—' বলতে-বলতে ছুটে আসছিল ছেলেটা। কিন্তু তিনজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর কথা আটকে গেল মাঝপথেই।

'ও হচ্ছে সাবু—' নতুন বালকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল কুন্তল।

রঘুপতি বিড়বিড় করে বলল, 'এর নাম বিলু। এ-বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজ করে।'

অশোকচন্দ্র কুন্তলকে জিগ্যেস করলেন, 'সবসময় তোমরা এমনই খেলা করো?'

'না, না। যখন বিলুদার কোনও কাজ থাকে না তখন খেলি।'

'চাচা চৌধুরি আর সাবু সেজে কী করো?'

'সারা বাড়ি আর বাগানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। দেখি কোথাও কোনও বিপদ হচ্ছে কি না। জানো তো, চাচা চৌধুরি সবার খুব উপকার করে। কাউকে ভয় পায় না। আর সাবুর গায়ে এমন জোর যে, উড়ন্ত এরোপ্লেনকে ধরে আছাড় দিতে পারে।'

শেষ কথাটা শুনে বিলু সাদা-সাদা দাঁত বের করে সরল হাসি হাসল।

জয়দেব সরকার একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে ফেলে রেখে বাচ্চাদের সঙ্গে এই গালগল্প! এ-গল্প তো পরেও করা যেত!

অধৈর্য হয়ে পড়েছিল রঘুপতিও। ও চাপা গলায় বলল, 'স্যার, গপসপ পরে হবে। আগে চলুন, বলরাম চৌধুরির কামরাটা দেখবেন চলুন।'

অশোকচন্দ্র শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে কুন্তলের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

রঘুপতির কথায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ওর দিকে তাকালেন মায়ার চোখে। তারপর হেসে বললেন, 'মাই ডিয়ার রঘুপতি, কতবার তোমাকে বলেছি যে, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুকোকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিও নেই আমার। তবে আমি অতি সাধারণ এক হুনুর—মানে, গোয়েন্দা—যে মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনও-রকমে কাজ চালিয়ে নেয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোকচন্দ্র কুন্তলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখন চলি, চাচা চৌধুরি। পরে তোমার সঙ্গে আবার গল্প করব।' তারপর রঘুপতিকে: 'চলো, কোথায় নিয়ে যাবে চলো— ।'

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে পেঁছে গেলেন একটা সুদৃশ্য কাঠের দরজার সামনে। রঘুপতি যাদব কলিংবেলের বোতাম টিপল। কুন্তল আর বিলু দৌড়ে চলে গেল বাগানের দিকে।

এ-বাড়িতে আসার পথে রঘুপতি আরও অনেক খবর দিয়েছে এসিজিকে। প্রত্যেকের জবানবন্দীর সারমর্ম জানিয়েছে। এসিজির কিছু এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে।

অশোকচন্দ্র বেশ বুঝতে পারছিলেন রঘুপতি টেনশানে ভুগছে। ধৈর্য ব্যাপারটা ওর বরাবরই একটু কম। এখন সেটা বোধহয় আরও কয়েক দাগ কমে গেছে।

বলরাম চৌধুরির শোবার ঘরে এসে রঘুপতির টেনশানটা আরও স্পষ্ট হল। ও হাত-পা নেড়ে খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু বলতে শুরু করল। ওর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল একইসঙ্গে।

'গুপ্তাসাব—' কখনও-কখনও অশোকচন্দ্রকে এই নামেও ডেকে

থাকে রঘুপতি ঃ 'ঘরের সবকিছু সেদিনের মতোই আছে। শুধু ডেডবডি আর রক্তমাখা বালিশটা সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও চিজ ইধার-উধার করা হয়নি।'

ঘরে ঢোকার সময় রঘুপতি বলরাম চৌধুরির দু-ছেলেকেই ডেকে নিয়েছে। সতীনাথ চৌধুরি গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালেও মণিনাথ বেশ বিরক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন। মণিনাথের সঙ্গে তাঁর গানের গুরু অশোক জানাও এসে উপস্থিত।

রঘুপতি চাপা গলায় সকলের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে এসিজিকে।

মণিনাথ ভুরু কুঁচকে হাই-পাওয়ার চশমার কাচ দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমার এখানে হাজির থাকাটা কি খুব জরুরি? নতুন একটা সুর তৈরি করছিলাম···মানে, যা বলার পুলিশকে তো আগেই জানিয়েছি....বাবা তো আর ফিরে আসবেন না···।'

সতীনাথ চৌধুরি শুধু স্থির ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে। সে-দৃষ্টিতে নীরব শাসন ছিল। মণিনাথ তৎক্ষণাৎ কথা থামিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। সেই অবস্থাতেই বন্ধু এবং গুরু অশোক জানার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

গানের মাস্টারমশাইয়ের গলার শিরা কণ্ঠা ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট। কে জানে প্রতিদিন গানের চর্চা করে এই অবস্থা হয়েছে কি না। আর গলার দৈর্ঘ্যও নেহাত ফেলনা নয়।

তিনি গুনগুন করে কী একটা সুর ভাঁজছিলেন। কালো ঠোঁট পানের রসে লালচে। বন্ধুর দৃষ্টি লক্ষ করে তাঁর পিঠে হাত রেখে জড়ানো গলায় বললেন, 'বড়দার কথা অমান্য করতে নেই, মণিভাই। ও-সুর আমি পরে তুলিয়ে দেব'খন— ।'

বলরাম চৌধুরির ঘরের দরজা যে আবার মেরামত করা হয়েছে সেটা লক্ষ করলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে নতুন হাজির হওয়া

তিনটি মানুষকে খুঁটিয়ে জরিপ করলেন।

তালা খুলে রঘুপতি যাদব বলরাম চৌধুরির ঘরে আমন্ত্রণ জানাল এসিজিকে। জয়দেব সরকারকেও ডাকল: 'আসুন, জয়দেববাবু—।'

কিন্তু সতীনাথ ও মণিনাথকে অনুসরণ করে যখন অশোক জানা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন মুখিয়ে দাঁড়াল রঘুপতি: 'আপ কিঁউ আ রহে হ্যায়, মাস্টারজি?'

অশোক জানা কয়েকবার ঢোঁক গিলে ইতস্তত করে বললেন, 'না, মানে, মণিভাই খুব সেন্টিমেন্টাল তো···হঠাৎ যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায়···পিতৃশোক বলে কথা···।'

'তার জন্যে আমরা আছি। আপ দফা হো যাইয়ে—।'

'মানে!'

'মানে আপনি আসতে পারেন—' বলেই দরজাটা 'মাস্টারজি'র মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে রঘুপতি।

তারপর উত্তেজিতভাবে শুরু করেছে ওর ধারাবিবরণীর রাজধানী এক্সপ্রেস।

এসিজি একহাতে সিগারেটে টান মারছিলেন, আর অন্য হাতে টানছিলেন সাদা চুলের গোছা। চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ঘরের প্রতিটি জিনিস প্রায় গোগ্রাসে গিলছিল।

ঘরে বড়-বড় দুটো জানলা—দুটোই বাগানের দিকে। জানলায় ঘিয়ে রঙের সুদৃশ্য গ্রিল বসানো। গ্রিলের ওপাশে ঘষা কাচের শার্সি বসানো পাল্লা। গ্রিলের লোহাগুলো প্রায় আট মিলিমিটার পুরু। এ-গ্রিল কাটার বা ভাঙার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদ আর আলো এসে পড়েছে ঘরে।

একটা জানলার সোজাসুজি বলরাম চৌধুরির খাট। আর-একটা জানলার সামনে বসানো রয়েছে একটা বড় টেবিল। টেবিলে

প্রচুর ফাইল আর কাগজপত্র। আর তার সামনে একটা গদি-আঁটা স্টিলের চেয়ার—টেবিলের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরানো।

এ ছাড়া ঘরে টিভি, আলনা, আলমারি, টেলিফোন, কোয়ার্টজ দেওয়াল-ঘড়ি আর একটা বুক কেস রয়েছে।

স্টিলের চেয়ারটা ছাড়া অতিথিদের বসার জন্য ঘরে দুটো লাল রঙের প্লাস্টিকের কিউব রয়েছে। আর তার সঙ্গে মানানসই প্লাস্টিক আর কাচে তৈরি একটা শৌখিন টি-টেবল।

টেবিলের কাছে গিয়ে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলল রঘুপতি যাদব। জয়দেব সরকারকে ইশারায় ডেকে বলল, 'মিস্টার সরকার, সেই সকাল থেকে আপনি বোধহয় বোর হয়ে গেছেন। এইবার আপনার সাবজেক্টে এসে গেছি। ইধর আইয়ে। দেখিয়ে—' বলে খোলা ড্রয়ারের ভেতরে আঙুল দেখাল রঘুপতি: 'রেয়ার কয়েন্স। তবে জেনুইন রেয়ার কি না আপনি বলতে পারবেন।'

ড্রয়ারটার কাছে এসে জয়দেব সরকার মানুষটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। এতক্ষণ যার কথাবার্তায় চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এখন সে যেন শিকারী চিতা হয়ে গেল পলকে।

ড্রয়ারে একটা সাদা কাগজের ওপরে অন্তত পনেরো-বিশটা বড় মাপের তামার পয়সা পড়ে আছে। তার বেশিরভাগই বদখত চেহারার, গায়ে সবুজ কপার সালফেটের দাগ-ধরা।

জয়দেব সরকার গোটা ড্রয়ারটাকে বাইরে বের করে নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর থিংকিং মেশিনকে তাজ্জব করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তামার পয়সাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রঘুপতি আর এসিজি ভদ্রলোকের দুপাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কাজ-কর্ম লক্ষ করছিলেন।

একটা-একটা করে প্রত্যেকটা কয়েন দেখলেন জয়দেব সরকার।

একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে পকেট থেকে পেন বের করে কীসব লিখে নিতে লাগলেন মাঝে-মাঝে।

রঘুপতি যাদব আবেগহীন গলায় মন্তব্য করল, 'আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করুন, মিস্টার সরকার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের টিম তাদের কাজ কমপ্লিট করে গেছে।'

'অ্যাঁ—' জয়দেব সরকার আচমকা মনোযোগ ভেঙে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বোধহয় রঘুপতির কথার সারমর্ম তাঁর মাথায় ঢুকল। তাই 'ও, ঠিক আছে—' বলে আবার মাথা নামিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর জয়দেব সরকার আতসকাচ টেবিলে রেখে মাথা তুলে এসিজি আর রঘুপতিকে দেখলেন। একটু দূরে সতীনাথ আর মণিনাথ চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোক ইতস্তত করে জিগ্যেস করলেন এসিজিকে, 'ওঁদের সামনেই বলব ?'

'বলুন—।'

এসিজি হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা হাতে নিয়ে জানলার গ্রিলের দিকে এগোলেন। টুকরোটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার সময় কয়েকটা গাছগাছালির পাশে কুন্তলকে দেখতে পেলেন।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন এসিজি।

কুন্তল ছুটে গ্রিলের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার পাগড়ি তখনও একই ঢঙে বসানো। ওর [illegible] হাত পিছনে সাবু, ওরফে বিলু।

'কী করছ, চাচা চৌধুরি ?'

কুন্তল চোখ বড়-বড় করে বলল, 'বাড়ির ওপরে ওয়াচ রাখছি··· কখন কী বিপদ হয়।'

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাচ্চাটার সরল চোখ দেখলেন অশোকচন্দ্র।

তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, খেলা করো গিয়ে।'

এসিজি গ্রিলের নকশাটা বেশ ভালো করে দেখলেন। সত্যি, এ-গ্রিল কারও পক্ষে কাটা বা বেঁকানো বেশ কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া সেরকম কোনও চেষ্টার ছাপ কোনও গ্রিলেই দেখেনি রঘুপতি।

এসিজি টেবিলের কাছে ফিরে এসে নতুন একটা সিগারেট ধরাতেই জয়দেব সরকার গলাখাঁকারি দিলেন, বললেন, 'স্যার, মিস্টার চৌধুরি ইদানীং বোধহয় রেয়ার কয়েন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন— ।'

'কেন ?' রঘুপতি জিগ্যেস করল।

'কারণ, আমি জানি একজন বিদেশি বায়ার—মানে, খদ্দের—এখন বিশেষ কয়েকটা কয়েনের জন্যে হন্যে হয়ে কলকাতা আর তার আশেপাশে চষে বেড়াচ্ছে। একইসঙ্গে প্রচুর দালালও ঘুরছে বাজারে। মিস্টার চৌধুরির পয়সাগুলোর মধ্যে সেরকম কয়েকটা কয়েন দেখতে পাচ্ছি— ।'

সতীনাথ আর মণিনাথ খুব তাড়াতাড়ি ওঁদের কাছে চলে এলেন। প্রায় হাঁ করে জয়দেব সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওদের নজর ছিটকে যাচ্ছিল কয়েন-গুলোর দিকে।

'আপনাদের বাবার কাছে কয়েনের খোঁজে কোনও লোকজন আসত ?' রঘুপতি দু-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

মণিনাথ বললেন, 'কীসের খোঁজে আসত জানি না, তবে বেশ কিছুদিন ধরে দেখতাম উল্টোপাল্টা ধরনের লোক বাবার কাছে আসত।

'বেশ কিছুদিন বলতে ?' এসিজি জানতে চাইলেন।

'এই মাস চার, সাড়ে চার—' উত্তর দিলেন সতীনাথ। অবশ্য উত্তর দেওয়ার আগে মণিনাথের নীরব সমর্থন খুঁজেছেন।

জয়দেব সরকার বলে উঠলেন, 'প্রায় মাসছয়েক ধরে এই কয়েন

খোঁজার ঢেউ উঠেছে। কলকাতা থেকে ব্যাপারটা এখন গ্রাম-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে।'

'রেয়ার কয়েনের কথা কী বলছিলেন—' সতীনাথ আসল প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন না।

জয়দেববাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, 'যেসব রেয়ার কয়েনের খোঁজ চলছে তার মধ্যে বেশিরভাগই হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাফ আনা, মানে, আধ আনা। কয়েন-গুলো বাজারে ছাড়ার বছরগুলো হলো ঃ ১৬১৬, ১৭১৭, ১৮০৬, ১৮১৮, ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪২, ১৮৪৪। এতে যেসব ছবির ছাপ আছে সেগুলো হল ঃ জোড়া ডাব, রাজা রামচন্দ্রের দরবার, হনুমান, জোড়া সাপ এইসব। পয়সগুলো মেইনলি তামার তৈরি, তার সঙ্গে বোধহয় কিছুটা করে ইরিডিয়াম মেশানো আছে—।'

'ইরিডিয়াম! ওটা তো রেয়ার মেটাল!' অশোকচন্দ্র গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন।

জয়দেব সরকার মাথা নেড়ে হাসলেন ঃ 'হয়তো সাধারণ ইরিডিয়াম নয়, তার কোনও রেডিওঅ্যাকটিভ আইসোটোপ। মানে ইরিডিয়াম-১৯১ আর ইরিডাম ১৯৩। তেজস্ক্রিয় হলেও ইরিডিয়ামের এই দুটো আইসোটোপ খুব স্টেবল—মানে, হাফ লাইফ অনেক বেশি।'

'তা হলে তো সেই কয়েনের রেডিওঅ্যাকটিভিটি থাকবে!' একটু ভয়ের গলায় বললেন এসিজি।

জয়দেব সরকার জোর দিয়ে বললেন, 'থাকবেই তো! তবে তার এফেক্ট কী হবে সেটা বলতে পারব না। বাজারের খবর হচ্ছে, এ-ধরনের পয়সা নাকি আতপ চাল টানে। মানে, চুম্বক যেমন লোহা টানে আর কী! তারপর কেউ-কেউ বলছে, তাতে নাকি আতপ চালের দানার রঙও পালটে যায়। তবে একটা ধান ভেঙে সঙ্গে-সঙ্গে তার চালের দানাটা দিয়ে টেস্ট করতে হবে—এতে নাকি

চালের দানাটায় কোনও ময়েশ্চার জমে না।'

'বলেন কী, মশাই!' মণিনাথ তাঁর হাই-পাওয়ার চশমা নাকের ডগায় ঠিক করে বসাতে-বসাতে বললেন।

জয়দেব সরকার মণিনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বললাম তো, এসব খবর আমার কানে এসেছে। গুজব না সত্যি বলতে পারব না। কারণ, এই চালের দানা টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি।'

সতীনাথের গম্ভীর মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। তিনি এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবাকে আমি বেশ কয়েকবার ধানের শিস নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেছি—।'

'বাবা কি চালের দানা নিয়ে কয়েন টেস্ট করছিলেন?' মণিনাথ যেন আপনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

'হতে পারে।' রঘুপতি বলল, 'তবে ইয়ে সচ হ্যায়, গুপ্তাসাব, কে আমরা ঘরের মেঝেতে বেশ কয়েকটা চালের দানা দেখেছিলাম। ওগুলোকে আমরা তেমন কোনও ইম্পর্ট্যান্স দিইনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেসটা কী—।'

'বাবার কালেকশানে কি ওরকম রেয়ার কয়েন সত্যি-সত্যি আছে?' সতীনাথ জয়দেব সরকারের কাছে জানতে চাইলেন।

'আছে। ১৭১৭, ১৮৩৯, আর ১৮৪০ সালের তিনটে আধ আনা এখানে আছে—' আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা কয়েনগুলোর দিকে দেখালেন জয়দেববাবু।

'সত্যি?' বিস্ময় মেশানো প্রশ্নে যেন ফেটে পড়লেন মণিনাথ আর সতীনাথ।

এসিজি বেশ অবাক হয়ে তাকালেন জয়দেব সরকারের দিকে। রঘুপতির চোয়ালের রেখা শক্ত হল, চোখ ছোট হয়ে এল।

কয়েক সেকেন্ড সবাইকেই উৎকণ্ঠায় রেখে তারপর হাসলেন জয়দেব সরকার: 'সাল তারিখ ঠিক থাকলেও এই তিনটে পয়সাই

নকল। তা না হলে এগুলোর এক-একটার দাম কম করেও কয়েক লক্ষ টাকা হত।'

এ-কথায় কয়েকটা বেলুন যেন চুপসে গেল ঘরের মধ্যে।

'এরকম প্রচুর নকল কয়েন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে কিনে ঠকছেও। আবার কেউ-কেউ কয়েন হাতে পেয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাচ্ছে।' কথা বলতে-বলতে টেবিল থেকে আতসকাচটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন জয়দেব সরকার।

রঘুপতি যাদব সতীনাথ আর মণিনাথের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনারা কয়েনের ব্যাপারে কিছু জানেন না?'

দুজনেই মাথা নাড়লেন।

এসিজি সিগারেট হাতে নিয়ে ঘরটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলেন। কখনও দরজার কাছে, কখনও বিছানার পাশে, আর কখনও বা জানলার গ্রিলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন।

'মিস্টার সরকার—' জয়দেববাবুকে লক্ষ করে বলল রঘুপতি, 'দেখুন তো, টেবিলের এইসব কাগজপত্রে কয়েনের ব্যাপারে আর কিছু পান কি না—।'

একটুও ব্যস্ত না হয়ে জয়দেব সরকার টেবিলের কাছে এলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে একটা-একটা করে কাগজ দেখতে লাগলেন।

সতীনাথ চৌধুরি রঘুপতি যাদবকে লক্ষ করে সামান্য রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন, 'কবের মধ্যে আপনি কেসটা সল্‌ভ করছেন, ইন্সপেক্টর যাদব?'

রঘুপতি অশোকচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, 'কোশিশ তো করছি। সেইজন্যেই আজ আমার স্যারকে নিয়ে এসেছি।'

তাচ্ছিল্যের চোখে এসিজির দিকে দেখলেন সতীনাথ। তারপর: 'বাবা আমাদের পার্টিকে বিরাট ডোনেশান দিতেন। আমার ওপর খুব চাপ আসছে—।'

মণিনাথ যেন দাদাকে সায় দিতেই বলে উঠলেন, 'সল্‌ভ করতে

না পারেন, অন্তত কাউকে অ্যারেস্ট তো করুন— ।'

রঘুপতির বসন্তের দাগ-ধরা মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। ও অভদ্র স্বরে জবাব দিল, 'অ্যারেস্ট ম্যায় আভি ইসি বক্ত কর সকতা হুঁ। লেকিন সে আপনার হেল্‌থের পক্ষে ভালো হবে না।'

মণিনাথ স্পষ্ট শিউরে উঠে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলেন।

'এই কাগজটা দেখুন—' জয়দেব সরকার একটা কাগজ দেখিয়ে সকলের মনোযোগ চাইলেন, 'এটা একটা কয়েনের টেস্ট রিপোর্টের জেরক্স কপি।'

রঘুপতি আর এসিজি কাগজটা দেখার জন্য জয়দেববাবুর খুব কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন।

'ম্যাড্রাসের "জুপিটার" নামের কোনও এক কম্পিউটারাইজ্‌ড এয়ার কন্ডিশন্‌ড ল্যাবরেটরিতে এই টেস্টটা করা হয়েছে। ১৬১৬ সালের কপার-ইরিডিয়াম হাফ আনা কয়েন। হাতে পাঞ্চ করে তৈরি। ভর ৮২ গ্রাম ৭০০ মিলিগ্রাম। আর কয়েনটা এক সেন্টিমিটার পুরু।' রিপোর্টটা আর-একবার দেখে নিয়ে জয়দেব সরকার বললেন, 'এ ছাড়া রেডিওঅ্যাকটিভিটিও বেশ আছে দেখছি— ।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'এই জেনুইন কয়েনটা হাতে পেলে তার দাম মোটামুটিভাবে কত হতে পারে, মিস্টার সরকার? লাখ টাকা?'

রিপোর্টটা টেবিলে রেখে দিয়ে একটু হেসে জয়দেববাবু বললেন, 'যে সত্যি-সত্যি অ্যান্টিক কয়েনের কদর বোঝে, তার কাছে এর দাম অনায়াসে কয়েক কোটি টাকা হতে পারে।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল। অনেকক্ষণ সবাই চুপ। শুধু কোয়ার্টজ ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার টিকটিক শব্দ।

ওই নোংরা চেহারার কয়েনগুলোর এত দাম! ভাবল রঘুপতি।

অশোকচন্দ্র স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'রঘুপতি, এবার তুমি বোধহয় বলরামবাবুর মার্ডারের জেনুইন মোটিভের হদিস পেয়ে গেছ।'

হঠাৎই সতীনাথ ও মণিনাথের দিকে ফিরে এসিজি বিনীতভাবে বললেন, 'আপনারা যদি একটু বাইরে অপেক্ষা করেন তা হলে ভালো হয়। আমরা একটু আলাদা কথা বলতে চাই— ।'

'ওঃ, শিওর—' বলে সতীনাথ দরজার দিকে এগোলেন।

মণিনাথ দাদাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেবিলের কয়েনগুলোর দিকে কয়েকবার দেখলেন।

ওঁরা চলে যেতেই রঘুপতি দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। তারপর বলল, 'গুপ্তাসাব, এবার বলুন, কী বুঝলেন ?'

'একটা ব্যাপার আমি বোধহয় সল্ভ করতে পেরেছি, রঘুপতি— ।'

'কোন ব্যাপার ?'

'তোমার ক্লোজ্ড রুম প্রবলেম। বন্ধ ঘর থেকে খুনী কীভাবে পালাল সেটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি।'

রঘুপতি প্রত্যাশা-ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল প্রাক্তন স্যারের দিকে।

জানলার কাছে গিয়ে সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটা বাইরে ফেলে দিলেন এসিজি। তারপর ঘাড়ের-কাছে-নেমে-আসা সাদা চুলের গোছায় বারকয়েক টান মেরে বললেন, 'চলো, রঘুপতি। এবারে যাওয়া যাক। তবে যাওয়ার আগে চাচা চৌধুরির সঙ্গে একবার কথা বলে যাব—খুব জরুরি কথা।'

রঘুপতি বেশ অবাক হলেও কিছু বলল না।

ঘরটা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বেরিয়ে এলেন বাইরে। ওঁকে অনুসরণ করে জয়দেব সরকার ও রঘুপতি যাদব।

'রঘুপতি, এই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে তুমি

একটু নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত শুরু করো। আর আমি তোমাকে বাড়তি কিছু ইনফরমেশন দেব। মনে হয়, এ-থেকে তুমি দিন-সাতেকের মধ্যেই মার্ডারারকে খাঁচায় পুরতে পারবে।' প্রাক্তন ছাত্রের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'কী, খুশি তো?'

কথা বলতে-বলতে ওঁরা বাড়ির মোজেইক করা চাতালে বেরিয়ে এসেছিলেন। সতীনাথ আর মণিনাথ কোথা থেকে যেন ওঁদের দেখতে পেয়ে ব্যস্ত পায়ে কাছে চলে এলেন।

রঘুপতি সতীনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের কো-অপারেশনের জন্যে ধন্যবাদ।'

সতীনাথ সৌজন্য দেখিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজির কথায় সেটা আর বলে উঠতে পারলেন না।

'আপনার ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, কয়েকটা কথা বলব—।'

'তার মানে! বাবার মার্ডারের ব্যাপারে ওইটুকু বাচ্চার কী বলার আছে!' বেশ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন সতীনাথ।

'চাচা চৌধুরি আর সাবুর গল্প করব। সে আপনি বুঝবেন না।' হেসে বললেন এসিজি। তারপর রঘুপতিকে চোখের ইশারা করলেন। যার মানে, 'কুন্তলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

রঘুপতি বাড়ির ভেতর দিকে রওনা হতেই সতীনাথ আহত গলায় বললেন, 'থাক, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি—।'

সতীনাথ চলে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কুন্তল চলে এল লাফাতে-লাফাতে। এখন ওর মাথায় পাগড়ি নেই, কোমরের বেল্টও উধাও।

'আমাকে ডেকেছ?'

'হ্যাঁ, তোমার দাদুর ব্যাপারে একটু চাচা চৌধুরির সাহায্য

চাই। চলো, বাগানে চলো।'

ভ্যাবাচ্যাকা মণিনাথকে চাতালে দাঁড় করিয়ে রেখে এসিজি কুন্তলকে নিয়ে বাগানের গাছপালার মধ্যে চলে এলেন। ওঁকে অনুসরণ করে সঙ্গী হলেন জয়দেব সরকার আর রঘুপতি যাদব।

নানান গাছের ফাঁক দিয়ে বলরাম চৌধুরির ঘরের জানলা দুটো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে আঙুল তুলে এসিজি কুন্তলকে জিগেস করলেন, 'বলো তো, চাচা চৌধুরি, লাস্ট সোমবার দুপরে তুমি কি কাউকে ওই জানলার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?'

'দাঁড়াও, ভেবে বলছি—' বাচ্চা ছেলেটা আঙুলে কর গুনতে লাগল আর ধীরে-ধীরে বিড়বিড় করে বলতে জাগল, 'শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ···।'

'কুন্তলবাবু, চাচা চৌধুরির বুদ্ধি কম্পিউটারের মতো প্রখর। চাচা চৌধুরি একবার যা দ্যাখে তা কখনও ভোলে না—' অশোকচন্দ্র কুন্তলকে উৎসাহ দিতে চাইলেন।

'মনে পড়েছে! মনে পড়েছে!' কুন্তল আচমকা লাফিয়ে উঠে বলল, 'গানকাকু ওই ডানদিকের জানলার গ্রিলের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছিল।'

'গানকাকু!'

'হ্যাঁ। কাকুমণিকে যে গান শেখায়।'

এসিজি 'চকাৎ' শব্দে একটা চুমু খেলেন কুন্তলের গালে। তারপর বললেন, 'থ্যাঙ্ক য়ু, চাচা চৌধুরি। তুমি আমার চেয়েও বড় হুনুর।'

'হুনর মানে!' অবাক চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাল কুন্তল।

'এটা ফারসী শব্দ—বাংলায় ঢুকে পড়েছে। এর মানে হল, খুব বুদ্ধিমান—এককথায় গোয়েন্দা বলতে পারো। আজ আমরা চলি। পরে একদিন এসে তোমার সঙ্গে খুব গল্প করব।'

চৌধুরি ভিলার বাইরে এসে রঘুপতি এসিজিকে জিগ্যেস করল,

'ব্যাপারটা কী হল, গুপ্তাসাব ?'

এসিজি নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ড্যাম সিম্পল, রঘুপতি। গানের মাস্টারমশাই অশোক জানা-ই হচ্ছে কালপ্রিট—তোমার রেয়ার বার্ড। তবে সেরকম কোনও প্রমাণ তো নেই। তুমি ওকে খাঁচায় পুরে ছত্রিশ রকম পুলিশী দাওয়াইয়ের সাঁইতিরিশটি ডোজ অ্যাপ্লাই করলেই বোধহয় স্বীকারোক্তি পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু জানলার কাছে উনি কী করছিলেন ?' জয়দেব সরকার জানতে চাইলেন।

ওঁরা কথা বলতে-বলতে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে এসিজি বললেন, 'রঘুপতি, রামভক্ত হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে আসার গল্পটা তোমার মনে আছে তো! বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে গোটা পর্বতটাই বয়ে নিয়ে এসেছিল পবন-নন্দন।' সিগারেটে পরপর দুটো লম্বা টান দিয়ে তারপর : 'এও অনেকটা সেইরকম। জানলার গ্রিলটা কাটতে বা ভাঙতে না পেরে অশোক জানা হনুমানের মতো গোটা গ্রিলটাই খুলে নিয়েছিল জানলার ফ্রেম থেকে। এই কাজের জন্যে খানিকটা নারকোল তেল আর একটা ভারি স্ক্রু-ড্রাইভারই যথেষ্ট। আমার ধারণা, ও আগে থেকেই গ্রিলের বেশ কয়েকটা স্ক্রু খুলে রেখেছিল। ঘটনার দিন শেষ একটা কি দুটো স্ক্রু খুলে গ্রিল সরিয়ে ও বলরামবাবুর ঘরে ঢোকে। তারপর নিজের কুকর্ম আড়াল করতে জানলার ঘষা কাচের পাল্লা ভেজিয়ে দেয়। কাজ সেরে বেরিয়ে এসে যখন ও গ্রিলটা আবার জায়গামতো বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিচ্ছিল, তখনই বোধহয় কুন্তল ওকে দেখতে পায়। ব্যস, এই হল তোমার ক্লোজ্ড রুম প্রবলেম।'

একটু থেমে এসিজি রঘুপতিকে, জিগ্যেস করলেন 'কী, এবার খুশি তো ? এবার পারবে তো জাল গোটাতে ?'

রঘুপতি চওড়া হেসে বলল, 'স্যার, ভাগ্যিস আপনি শার্লক হোমসের মতো পাইপ টানতে পারেন না, আর এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফ আপনার নেই!'

'কেন, তা হলে কী হত?' কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

'তা হলে আপনি গল্পের বইয়ের পাতায় ঢুকে যেতেন। বলরাম চৌধুরির মার্ডার কেস আর সল্‌ভ হত না।'

ওঁরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন জোর গলায়।

• চুনিলালবাবুর লাল চুনি •

'গুপ্তাসাব, ব্যাপারটা ঠিক খুন নয়—তবে অনেকটা খুনের মতো।'

গাড়ির জানলার বাইরে চোখ রেখে বিকেলের কলকাতা দেখতে-দেখতে কথাটা বলল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

ক্যাডবেরি রঙের মারুতি আটশো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ছুঁয়ে এগোচ্ছিল বাগবাজারের দিকে। গাড়ির পিছনের সিটে উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল রঘুপতি। ওর পাশেই বসে অধ্যাপক ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে এসিজি। তাঁর সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত ডানহিল সিগারেট।

এমনিতে এসিজির প্রিয় উইল্‌স ফিলটার। কিন্তু রঘুপতি কোথা থেকে যেন এক কার্টন ডানহিল জোগাড় করে এসিজিকে উপহার দিয়েছে একটু আগেই। আর সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে একটা সমস্যা—যেটা ঠিক খুন নয়, খুনের মতো।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রাক্তন ছাত্র রঘুপতিকে দেখছিলেন এসিজি।

ছোট করে ছাঁটা চুল, কাঁচা-পাকা চওড়া গোঁফ, ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। হাতের শিরা এবং পেশি দুশমনদের সাবধান করে দেওয়ার মতো। আর চোয়ালের উদ্ধত রেখা সেখানে জুড়ে দিয়েছে একটা বেপরোয়া ভাব। এ ছাড়াও একটা 'কিলার ইন্সটিংক্ট' যেন আবছাভাবে খুঁজে পাচ্ছিলেন এসিজি।

ছাত্রজীবনের রঘুপতির সঙ্গে আজকের কাজপাগল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদবের কতটা অমিল, সেটাই ভাবছিলেন ওর প্রাক্তন 'স্যার' অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

'এ ছাড়া, স্যার, ব্যাপারটার মধ্যে পাখিও আছে—' এসিজির

দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল রঘুপতি, 'আপকা ফেবারিট—পন্ছি। অওর উসকে সাথ এক রুবিকি কহানী।'

মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তুললেন অশোকচন্দ্র ঃ 'রুবির কাহিনী? তার মানে!'

'রুবি—যাকে বাংলায় আপনারা চুনি বলেন। জেমস্টোন। খুব কস্ট্লি।'

ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন এসিজি। বললেন, 'তোমার টেনশান কমাও রঘুপতি। তখন থেকে যেরকম খাপছাড়াভাবে ইনফরমেশানের টুকরো ছড়িয়ে চলেছ, তাতে আমার মতো থিঙ্কিং মেশিনেরও মস্তক ঘূর্ণিত। তোমাকে তো বহুবার বলেছি, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাউ কাম অন, বেশ রয়েসয়ে গুছিয়ে গল্পটা বলো আমাকে।'

একটু আহত হয়ে রঘুপতি বলল, 'বলছি, গুপ্তাসাব, কিন্তু "ঘূর্ণিত" মানে কী?'

হো-হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ হুনুর। ছোট-হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সে তোমাকে পরে বলে দেব। এখন শুরু করো তোমার "রুবিকী কহানী"—।'

ওঁদের গাড়ি তখন বাগবাজারের বাটার দোকানের কাছে বাঁদিকে বাঁক নিচ্ছে।

রঘুপতি যাদব একটু গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সামান্য ছোট হয়ে এল।

ওর পাশে বসা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা বৃদ্ধ মানুষটি তখন আনমনাভাবে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছেন, আর বাগবাজার বাটার মোড়ে পুজোর কেনাকাটার ভিড় দেখছেন। কিন্তু তাঁর কান ও মস্তিষ্কের মনোযোগ পুরোপুরি রঘুপতির দিকে। রঘুপতির কাছ থেকে সংক্ষেপে যা জানা গেল,

তা হল এই :

বাড়িটার নাম 'লালমহল'। বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি দু-মহলা পুরনো বাড়ি। বাড়ির দালানে বিশাল-বিশাল ডোরাকাটা থাম। থামের মাথায় কার্নিশের খাঁজে গোলা পায়রার বাস। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এখনও ছোট মাপের দুর্গাপুজো হয়।

ব্যাড়িটার রং লাল। অন্তত এককালে তাই ছিল। কালের প্রকোপে সেই লাল কোথাও গোলাপী, কোথাও বা বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। বাড়ির সদর দরজায় রং-চটা শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'রায়বাহাদুর রবীন্দ্রলাল গোস্বামী'।

রবীন্দ্রলাল অন্তত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে ইহলোক ছেড়েছেন। তবে তাঁর চার ছেলে এখনও বহাল তবিয়তে 'লালমহল'-এ বাস করেন।

বড় ছেলে শ্যামসুন্দরলাল গতকাল মারা গেছেন। তিনি সবসময় পাখি নিয়ে মেতে থাকেন—মানে, থাকতেন। বাড়ির অনেকটা অংশ তাঁর খাঁচায়-খাঁচায় ছয়লাপ।

মেজো ছেলে চুনিলাল মণিরত্নের ব্যবসা করেন। দেবদেবীভক্ত ধর্মভীরু মানুষ। অন্য ভাইদের মতো সংসার-ধর্ম করেননি।

সেজ রঙ্গলাল হিসেব মতো বেকার। তবে শোনা গেছে তিনি নাকি টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।

আর সকলের ছোট গজেন্দ্রলাল এখনও ঠিক কোনও ব্যবসায় থিতু হয়ে বসতে পারেননি।

ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল, দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্যামসুন্দরলালের কাছে একটা ফোন এসেছিল। কে ফোন করেছিল সেটা জানা যায়নি। টেলিফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে-বলতেই তিনি আচমকা হার্টফেল করে মারা যান।

তাঁর চিৎকারে বাড়ির অনেকে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

ব্যাপারটায় এমনিতে কোনও জটিলতা ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। তা ছাড়া শ্যামসুন্দরলালের বয়েসও হয়েছিল প্রায় বাষট্টি।

কিন্তু গোলমাল বাঁধালেন চুনিলালবাবু। তিনি বললেন যে, প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা টকটকে লাল চুনি তিনি তাঁর বড়দার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন।

সেটার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সেইজন্যই গুপ্তাসাবকে জরুরি তলব করেছে রঘুপতি। খুঁজে বের করতে হবে চুনিলালবাবুর চুনি।

রঘুপতির কথা শেষ হতে-না-হতেই এসিজি প্রশ্ন করলেন, 'শ্যামসুন্দরলালের মারা যাওয়ার ব্যাপারটাকে তুমি "খুনের মতো" বলছ কেন?'

'বলছি কী আর সাধে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঘুপতি। তারপর বলল, 'ওই হতচ্ছাড়া জেবরাতের জন্যে ক'দিন ধরেই কোন এক আদমি শ্যামসুন্দরবাবুকে থ্রেট করছিল। তাতে উনি ভয়ও পেয়েছিলেন, আবার খুব এক্সাইটেডও হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, উনি এভাবে মারা না গেলে হয়তো ওই আন্‌নোন পারসনের হাতে খুন হয়ে যেতেন... ।'

এসিজি এক ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলেন আবার। চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সেই লোকটা কেমন করে জানল যে, চুনিটা শ্যামসুন্দরলাল-বাবুর কাছে আছে?'

ঠোঁট উলটে রঘুপতি বলল, 'কে জানে! হয়তো কারও কাছ থেকে ইনফরমেশান পেয়েছে।'

'যখন শ্যামসুন্দর মারা যান তখন চুনিলাল কোথায় ছিলেন?'

'বাড়িতেই।' কথাটা বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রঘুপতি কী যেন দেখল। তারপর বলল, 'স্যার, আমরা লালমহলে এসে

গেছি।'

বাড়ির সামনে ভাঙাচোরা ট্রাম-রাস্তা। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে। বাড়ির উলটোদিকে দুটো বিশাল মাপের গোডাউন। তার পিছনেই বোধহয় গঙ্গা।

ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে রঘুপতি এসিজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আইয়ে, স্যার—ওয়েলকাম টু লালমহল।'

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের ভঙ্গি দেখে সামান্য হাসলেন। তারপর মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'চলো, দেখা যাক তোমার চুনিলালবাবুর চুনি উদ্ধার করা যায় কি না।'

কলিংবেল টিপতেই বাড়ির দরজায় একজন বয়স্ক পুরুষ এসে হাজির হলেন। দেখে বনেদী বাড়ির 'পুরাতন ভৃত্য' বলেই মনে হল। রঘুপতি নিজের পরিচয় দিতেই দ্রুত আদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে রঘুপতি যাদব নিচু গলায় বলল, 'ব্যাপারটা লালবাজার পর্যন্ত গড়াত না। তবে চুনিলালবাবুর থোড়াবহত আপার লেভেল কানেকশান্স আছে। সেইজন্যেই···।'

কথা বলতে-বলতে ওঁরা চৌকো মাপের বিশাল ঠাকুর-দালানে এসে পড়েছিলেন। তার একপাশে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। এখন শুধু শেষ তুলির টান আর সাজসজ্জা বাকি।

হঠাৎই ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামলা রঙের একজন ভদ্রলোক। তাঁর ডান হাতের তিন আঙুলে রুপো দিয়ে বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। প্রকট হেসে তিনি বললেন, 'আগমনের খবর পেয়েছি / তাই রিসিভ করতে এসেছি। অধমের নাম রঙ্গলাল / চুনিটা বেপাত্তা হয়েছে গতকাল।'

এসিজি অবাক হয়ে লালমহলের রঙ্গলালবাবুকে দেখছিলেন।

পরনে ফতুয়া গোছের পাঞ্জাবি আর ধুতি। মাথার মাঝখানে

সিঁথি। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুল। ছোট-ছোট চোখ। কপালের বাঁদিকে একটা ছোট আঁচিল। নাকটা সামান্য বড় মাপের। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মুখে প্রসাধনের সুবাস। আর সদাসঙ্গী আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

'শ্যামসুন্দরলালবাবু কোন ঘরে মারা গিয়েছিলেন?' রঘুপতি জানতে চাইল।

রঙ্গলাল অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'দোতলার পাখি-ঘরে / ওই ঘরটার ঠিক ওপরে—' আঙুল তুলে দূরের কোণে একটা ঘর দেখালেন তিনি।

এসিজি যে-কথাটা মনে-মনে ভাবছিলেন, সেটাই মুখে প্রকাশ করলেন, 'আপনি কি সবসময় ছড়া কেটে কথা বলেন?'

রঙ্গলালবাবু মাথা সামান্য নিচু করে বললেন, 'আমি একজন স্বভাব-কবি / কবিতায় কথা বলা আমার হবি।'

রঘুপতি যে এই উত্তর শুনে ঠোঁট টিপে হাসল সেটা বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ এড়ালো না।

পুজো এবার দেরিতে। তাই রোদ্দুর পড়ে আসছে তাড়াতাড়ি। উঠোন থেকেও রোদ সরে যাচ্ছে পুবের দিকে।

মাথার ওপরে কয়েকটা পায়রা ঝটপট করছিল। শান-বাঁধানো উঠোনে নানা জায়গায় ওদের অপকীর্তির ছাপ।

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে এগোলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। তখনই কোথা থেকে ছুটে এল বছর ন'-দশের একটা ছোট্ট মেয়ে। হাঁফাতে-হাঁফাতে রঙ্গলালবাবুকে লক্ষ করে বলল, 'জেঠু, মেজো-জেঠু বলেছে ওঁদের পাখিঘরে নিয়ে বসাতে।'

কথাটা বলেই মেয়েটা ছুট্টে চলে গেল।

রঙ্গলালবাবু বললেন, 'গজেন্দ্রর ছোট মেয়ে। সবসময়—'

'—চলে ধেয়ে।' পাদপূরণ করে হেসে উঠলেন এসিজি।

পুরনো আমলের শান-বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। পালিশ করা

মেহগনি কাঠের রেলিং। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর দেওয়ালে এক অভিজাত পুরুষের তৈলচিত্র। গিল্ট ফ্রেমে বাঁধানো। কে জানে, ইনিই হয়তো স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল গোস্বামী।

এসিজি আর রঘুপতি রঙ্গলালকে অনুসরণ করে উঠছিলেন। রঘুপতি চাপা গলায় ওর প্রাক্তন স্যারকে বলল, 'অজীব ব্যাপার, গুপ্তাসাব। যাঁর নাম চুনিলাল তিনি চুনি, মানে হিরে-জহরতের বেওসা করেন। যাঁর নাম রঙ্গলাল তিনি সবসময় মজাক করে কথা বলেন। তবে যিনি মারা গেছেন··· ।'

রঘুপতির কথায় বাধা দিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বললেন, 'শ্যামসুন্দরলাল গোস্বামীর নামটা প্রথম থেকেই আমার পিকিউলিয়ার লাগছিল। এরকম নাম কখনও শুনিনি। তবে "শ্যামসুন্দর" নামে একরকম মুনিয়া পাখি পশ্চিম বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের বাগানে এরা বাসা বাঁধে। মাপে চড়ুই পাখির মতো। মাথা কালো, বুক সাদা, বাকিটা গাঢ় বাদামী রঙের। ইংরেজি নাম "ব্ল্যাক হেডেড মুনিয়া", আর ল্যাটিন নাম "লোনচুরা মলাক্কা"। সুতরাং শ্যামসুন্দরলালবাবুর শখটাও তাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে।'

তা হলে বাকি রইলেন গজেন্দ্রলালবাবু। তিনি কি হাতির ব্যবসা করেন, নাকি হাতির খোঁজখবর রাখা তাঁর শখ?'

সামান্য মজা করে বলা রঘুপতি যাদবের শেষ কথাটা বোধহয় রঙ্গলালবাবুর কানে গিয়ে থাকবে। কারণ, হঠাই তিন-চার ধাপ ওপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হস্তী নয়—হস্তীদন্ত / গজেন্দ্রর পয়মন্ত।'

এসিজি আর রঘুপতি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। গজেন্দ্রলাল তা হলে হাতির দাঁতের ব্যবসা করেন!

গতকালই একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে এ-বাড়িতে। অথচ রঙ্গলালকে দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না তেমন কোনও আঘাত

পেয়েছেন। তবে বাড়িটাকে কেমন যেন বেশিরকম চুপচাপ মনে হল। শুধু পায়রার বকবকম ওঁদের কানে আসছিল।

এসিজির সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। দোতলার পাখিঘরে পৌঁছেই তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। ঘরটাকে একপলক দেখার পর তিনি যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সেটা রঘুপতি যাদব স্পষ্ট বুঝতে পারল।

কারণ, পাখিঘরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য পাখির স্টাফ করা মডেল। নানান মাপের রংবেরঙের পাখি। কিন্তু ওরা সকলেই স্থির, চুপচাপ।

পাখিঘরটাকে ঘর না বলে হলঘর বলাই ভালো। ঘরের মাপ অন্তত বিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট। ঘরের মেঝেতে সাদা-কালো মার্বেল পাথরের নকশা। সেই নকশায় সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি। এখনও দিব্যি ঝকঝকে তকতকে।

চুনিলালবাবু একটা আরাম-কেদারায় চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। হাতে জলন্ত সিগারেট। চোখ লাল।

ওঁদের ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা শেষ করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ইন্সপেক্টর যাদব। সরাসরি কাজের কথায় আসি। অশৌচ অবস্থায় কী বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়লাম বলুন তো!' একটু থেমে কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদবকে বসতে বললেন, 'বসুন, আপনারা বসুন। আপনারা আসছেন শুনে ছোটভাইকে বাইরের কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি আপনাদের জন্যে ওয়েট করছি।'

এমন সময় ছোট্ট মেয়েটা এক দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল। রঙ্গলালবাবুর কাছে গিয়ে বলল, 'বসন্তদা চা নিয়ে আসছে। মা পাঠিয়ে দিয়েছে— ।'

কথাটা শেষ করেই মেয়েটা বেণী দুলিয়ে আবার দে ছুট।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চা-মিষ্টি ইত্যাদি ট্রেতে সাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মাঝবয়েসী একজন লোক। শ্বেতপাথরের তৈরি একটা গোল টেবিলে কাপ-প্লেটগুলো নামিয়ে রাখতেই রঙ্গলালবাবু সেগুলো সবিনয়ে এগিয়ে দিলেন রঘুপতি ও অশোকচন্দ্রের দিকে।

চুনিলালবাবুর পরনে হাফহাতা সাদা শার্ট আর পাজামা। গলায় সরু সোনার চেন। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। জুলপির কাছটায় চুলে দিব্যি পাক ধরেছে। ভুরু লোমশ। দুই ভুরুর মাঝখানে চিরস্থায়ী বিরক্তির ভাব।

এসিজি ঘরটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরের আসবাবপত্র যা কিছু সবই ব্রিটিশ আমলের। একপাশে বড় মাপের চেয়ার-টেবিল। চেয়ারে ফুলকাটা তাকিয়া বসানো। আর টেবিলে গাদা-গুচ্ছের বই আর কাগজপত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে পেন-পেনসিল, আতসকাঁচ, পেতলের পেপারওয়েট আর কয়েকটা পাখির পালক। টেবিলের বাঁ দিকে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন।

দেখে বোঝাই যায়, এটা ছিল শ্যামসুন্দরলালের পড়াশোনার ঘর।

ঘরটার তিনদিকের দেওয়ালে বড়-বড় মাপের দেওয়াল আলমারি। তাতে ঠাসা রাজ্যের বই। এসিজির নজরে পড়ল সেখানে সালিম আলি ও ডিলন রিপলির কয়েকখণ্ডে লেখা ভারত ও পাকিস্তানের যাবতীয় পাখির হাত-বই পরপর সাজানো রয়েছে।

ঘরের সিলিং-এ ঝুলছে দুটো চার ব্লেডের পাখা। দেখে বোঝা যায়, ব্লেডগুলো কাঠের তৈরি। আর ঘরের দু-দিকের দেওয়ালে ডিজাইন করা শৌখিন পেতলের ব্র্যাকেটে ঝুলছে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় চুনিলালবাবু সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর রঘুপতির কাছে এসে বললেন, 'আমার দাদা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ওঁর হার্টের প্রবলেম ছিল ঠিকই, কিন্তু হয়তো আরও কয়েক বছর বাঁচতেন।

আমার জন্যেই অকালে বড়দার প্রাণটা গেল। বউদির দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। অথচ আমারও উপায় নেই। চুনিটা খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাকেও হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে হবে। তাই শোক তাকে তুলে রেখে পাগলের মতো চুনি খুঁজতে বসেছি…।'

চুনিলালবাবু থামতেই রঘুপতি তাকাল অশোকচন্দ্রের দিকে। বৃদ্ধ তখন চোখ বুজে সিগারেটে জম্পেশ টান দিচ্ছেন।

রঘুপতি বলল, 'গুপ্তাসাব, আমার সঙ্গে চুনিবাবুরই টেলিফোনে কথা হয়েছিল। আপনি ওঁকে কী জিগ্যেস করবেন করুন—।'

এসিজি চোখ খুলে পাখির মেলার দিকে তাকালেন। কম করেও একশো পাখি সাজানো রয়েছে ঘরের ডানদিকটায়। তার সবই পশ্চিমবাংলার পাখি। ছোট মাছরাঙা, বাঁশপাতি, টুনটুনি, চন্দনা, দোয়েল, কাদাখোঁচা, শ্যামা, ময়না, নীলকণ্ঠ, চাক দোয়েল, বেনেবউ, এমন কী একটা মোহনচূড়াও রয়েছে। পাখিগুলোর পায়ের কাছে সাদা কার্ডে ওদের পরিচয় লেখা—ঠিক যেমনটি জাদুঘরে থাকে।

এসিজি মাথার সাদা চুলে টান মেরে জানতে চাইলেন, 'ট্যাক্সিডার্মি করা এই পাখিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে?'

চুনিলালবাবু বললেন, 'দাদার খেয়াল। বেশিরভাগই কেনা। তবে কয়েকটা বোধহয় নিজে অর্ডার দিয়ে করিয়েছেন।'

'চুনির ব্যাপারটা আমাদের একটু খোলসা করে বলুন—।'

চুনিলালবাবু ওঁদের কাছাকাছি একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ উসখুস করে তারপর বললেন, 'আমি মণিরত্নের ব্যবসা করি। মানে, দামী পাথর কেনা-বেচা করি। নিজে পাথর কাটিংও করি, পালিশও করি। তবে সেরকম এক্সপার্ট নই। ছাদের দক্ষিণ দিকের একটা ছোট ঘরে আমার কাটিং মেশিন আর গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে।

'সে যাই হোক, পাথরের কাজকারবারে আমাকে প্রায় রোজই বটতলা আর মেছুয়ায় যেতে হয়। সেখানে মহাজনদের কাছ থেকে দরকার মতো মাল নিয়ে আসি। তো দিনসাতেক আগে মেছুয়াতে এক মহাজনের ঘরে আমি একটা বার্মিজ রুবি পেয়ে যাই। চুনি-টার রং ঠিক পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল। আর একেবারে বেদাগ।

'আমি সেখানে গিয়েছিলাম খড় কিনতে—'

'খড় মানে?' চুনিলালকে বাধা দিয়ে জানতে চেয়েছেন এসিজি।

'খড় মানে একেবারে র' পাথর—যেটা দেখে দামী পাথর বলে একেবারেই বোঝা যায় না। সেগুলো অ্যাসিড ট্রিট করে ঠিকমতো কেটে পালিশ-টালিশ করতে পারলে অনেকগুলো দামী পাথর পাওয়া যেতে পারে। এর আগে বেশ কয়েকবার খড় কিনে আমি ভালো প্রফিট করেছি।'

'তারপর কী হল?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল রঘুপতি।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার একজন কোটিপতি কাস্টমার বার্মিজ চুনির কথা বলে রেখেছিল। এই চুনিটার হদিস পেতেই আমার মনটা নেচে উঠল। এটা তাকে বেচতে পারলে অন্তত থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট করা যাবে।'

'সেই কাস্টমারের নাম কী?' রঘুপতি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

চুনিলালবাবু অবাক চোখে তাকালেন রঘুপতির দিকে: 'মাপ করবেন, ইন্সপেক্টর যাদব। কাস্টমারের নাম বলতে পারব না— ট্রেড সিক্রেট।'

মাথার সাদা চুলের গোছায় হাত চালিয়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'পাথরটার সাইজ কীরকম ছিল?'

চুনিলাল গোস্বামী ব্যবসায়ীর ঢঙে বললেন, 'প্রায় সাড়ে ন' রতি। মানে, পৌনে ন' ক্যারাট-এর কাছাকাছি।'

'ক্যারাট-এর হিসেব কেমন জট পাকিয়ে যায়', 'হেসে বললেন এসিজি, 'এক ক্যারাট মানে কত গ্রাম ?'

'দুশো মিলিগ্রাম। এই পাথরটার ওজন প্রায় পৌনে দু-গ্রাম মতো ছিল। আর বেশ লম্বাটে।'

'ফির কেয়া হুয়া ?' রঘুপতির ধৈর্যে যে ভালোরকম টান পড়েছে সেটা তার প্রশ্নের ঢঙেই বোঝা গেল।

চুনিলাল কী যেন চিন্তা করছিলেন। রঘুপতির প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, 'পাথরটা আমি চেনা মহাজনের কাছ থেকে দু-সপ্তাহের ধারে নিয়ে আসি। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার পরদিন থেকেই কেউ আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দিতে থাকে। বলে যে, পাথরটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করে সোজা আবার মহাজনের কাছে ফেরত দিয়ে আসি।

'মিস্টার গুপ্ত, আমাদের হিরে-জহরতের লাইনে উড়ো টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার ব্যাপারটা নেহাতই মামুলি। তাই আমি প্রথম-প্রথম ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু দিনতিনেক যেতে-না-যেতেই হুমকির ব্যাপারটা সিরিয়াস চেহারা নিতে থাকে। মার্কেট থেকে কানাঘুষোয় খবর পেলাম, এতবড় বার্মিজ চুনি বাজারে বহুদিন আসেনি। তাই হিসেব-ছাড়া দাম দিয়ে কেনার মতো দু-তিনজন কাস্টমার নাকি ওটার জন্যে হন্যে হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এজেন্টরা নাকি মারাত্মকরকম ডেঞ্জারাস।

'তখন আমি...' একটু থেমে চুনিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তখন আমি ব্যাপারটা বড়দাকে খুলে বলি। বড়দা ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে একরকম পুত্র স্নেহে ছোট-ছোট ভাইদের মানুষ করেছেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সজাগ হয়ে দেখাশোনা করেছেন। আমাদের সবরকম বিপদ-আপদ থেকে আগলে-আগলে রেখেছেন—' চুনিলালবাবুর চোখে জল এসে গেল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা দিয়ে

চোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'বড়দা চলে গিয়ে আমাদের মাথার ওপর থেকে বটগাছের ছায়া সরে গেল। আমার বিপদের কথা শুনে বড়দা আমাকে বললেন, "তোর কোনও চিন্তা নেই। তুই চুনিটা আমার কাছে দে, আমি ওটা রেখে দেব। তারপর দেখি, কে ওটা আমার কাছ থেকে নিতে পারে!"

'আমি সেইমতো বড়দাকে পাথরটা দিয়ে দিই পরশুর আগের দিন—মানে, শুক্রবার। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরদিন থেকেই সেই নাম-না-জানা লোকটা বড়দাকে যা-তা বলে শাসাতে থাকে।

'দাদার একটাই দোষ ছিল—অল্পেতেই ভীষণ রেগে যেতেন। এই করে-করেই হার্টের ট্রাবল বাঁধিয়েছিলেন। আগে দু-বার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তাই দাদা যখন লোকটার সঙ্গে টেলিফোনে চিৎকার করে কথা বলতেন তখন আমার ভয় করত। পরশু রাতেই আমি ঠিক করি, ঢের হয়েছে, চুনি বেচে প্রফিটে আর কাজ নেই। ওটা আমি মহাজনকে ফেরতই দিয়ে দেব। কিন্তু দাদাকে সে-কথা বলতেই তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। ফলে আমি গৃহশান্তির কথা ভেবে চুপ করে যাই।

'তারপর…তারপর, কাল দুপুরে, ওই লোকটা আবার টেলিফোন করে। দাদা তখন এই ঘরে ওই চেয়ারটায় বসেছিলেন। দাদার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আমি পাশের ঘর থেকে ছুটে আসি। দাদা তখন টেলিফোনে বলছেন, "আমি থাকতে কেউ চুনির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারবে না। আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়…।"

'আমি দাদাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ, দাদার তখন চোখ-মুখ লাল, বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ভয় হচ্ছিল, খারাপ কিছু না একটা হয়ে যায়…।'

চুনিলালবাবু একটু থামতেই এতক্ষণ নীরবে সাক্ষী হয়ে বসে থাকা রঙ্গলাল বললেন, 'সেই মুহূর্তে আমিও ছুটে আসি /

গজেনকেও পেলাম পাশাপাশি— ।'

চুনিলালবাবু বিরক্ত হয়ে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে ঃ 'আঃ, রঙ্গ, কী হচ্ছে ! পদ্য নিয়ে পাগলামির একটা লিমিট থাকা দরকার। এখন কি একটু স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায় না !'

রঙ্গলালের মুখে আহত ভাব ফুটে উঠল। তিনি মিনমিন করে স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'লিমিট থাকলে সেটা কখনও কবিতা হয় নাকি ! কবিতার নামে সেটা তখন হয়ে যায় ফাঁকি··· ।'

'দোহাই, তোর স্বভাবকবিতা এবার বন্ধ কর।' চুনিলালবাবু যে বেশ রেগে গেছেন সেটা তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

একটু সময় নিয়ে তারপর তিনি খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'তারপর আমাদের তিন ভাইয়ের চোখের সামনেই বুক খামচে ধরে বড়দা টেবিলে কাত হয়ে পড়েন। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই তিনি টেবিলে পড়েছিলেন বলে সেরকম আঘাত পাননি। কিন্তু বুকের কষ্টটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক হচ্ছিল। কারণ, তিনি বুকের কাছে হাত ঘষছিলেন বারবার। আর যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছিল তাঁর মুখ দিয়ে।

'আমি গজেনকে পাঠালাম পাড়ারই এক ডাক্তারকে তক্ষুনি ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, বড়দার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর প্রায় স্থির। মুখ থেকে একটানা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

'বড়দা আমাকে বলেছিলেন, চুনিটা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন যে, কেউ ওটা খুঁজে পাবে না। সে-কথা আমার মনে ছিল। তাই ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছি, "বড়দা, চুনিটা কোথায় রেখেছ ?"

'উত্তরে বড়দা গোঙানির মতো শব্দ করে দুবার বললেন, "পেলি না গো, পেলি না গো—" তারপরই সব শেষ।

'কাল দুপুর থেকে আমরা দাদার সৎকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর কাল সারা রাত ধরে আমি চুনিটার খোঁজ করেছি। বউদি ওই শোকের মধ্যেই আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছেন। আমাকে হয়তো সবাই অমানুষ ভাবছে, মিস্টার গুপ্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন। একে ওই হুমকি। তার ওপর চুনিটার দাম প্রায় পৌনে দু-লাখ টাকা। মহাজনকে যে এক কথায় দাম দিয়ে দেব তারও উপায় নেই। তাই মরিয়া হয়ে লোকজন ধরে লালবাজারে খবর দিয়েছি।'

কথা শেষ করে চুনিলালবাবু মাথা নিচু করলেন। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন কয়েকবার।

রঘুপতি জিগ্যেস করল, 'আপনারা সব জায়গা খুঁজে দেখেছেন? সিন্দুক-টিন্দুক, ব্যাঙ্কের লকার—সব?'

চুনিলালবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, 'আজ সকালেই বউদিকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলাম। লকারে ওটা নেই।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে-করতে চলে গিয়েছিলেন পাখির ঝাঁকের কাছে। রংবেরঙের পাখিগুলো দেখতে-দেখতে কল্পনায় যেন ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। ঘাড়ের কাছে সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। তারপর দূর থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন চুনিলালবাবুর দিকে: 'কোনও জায়গায় খুঁজতে বাকি রাখেননি? সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন?'

চুনিলালবাবু বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, প্রাণের দায়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। যে করে হোক চুনিটা মহাজনকে ফেরত দিয়ে আমাকে আগে প্রাণে বাঁচতে হবে।'

পাখিগুলো ভীষণ আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন।

নীচের তলা থেকে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এল। সেই সঙ্গে কোনও মহিলার বকাবকির শব্দ।

রঙ্গলালবাবুও বোধহয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, 'মেজদা, এমনও তো হতে পারে, বড়দা মারা যাওয়ার সময় চুনিটা কোথায় আছে সেটা বলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন···।'

বোঝা গেল, মেজদার ধমকে স্বভাবকবি তাঁর কাব্য প্র্যাকটিস আপাতত মুলতুবি রাখার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু রঙ্গলালবাবুর কথায় ঝটিতি ঘুরে তাকালেন থিঙ্কিং মেশিন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। দু-ভাইয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'শেষ কথাটা আপনারা ঠিক শুনেছিলেন?'

চুনিলাল ইতস্তত করে বললেন, 'আমার তো "পেলি না গো" বলেই মনে হয়েছিল। গোঙানির মধ্যে স্পষ্ট করে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'তুই কী শুনেছিস, রঙ্গ?'

একটু আমতা-আমতা করে রঙ্গলাল বললেন, 'আমার···আমার যেন "গেলি না গো" বলে মনে হয়েছিল···।'

'এর তো বাংলাটাও গণ্ডগোলের।' এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'বাক্যের প্রথমটা "তুই" সম্বোধনে, আর শেষটা "তুমি"···কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে···।'

রঘুপতি যাদব বেশ চিন্তিতভাবে রঙ্গলালবাবুকে বলল, 'আপনি ওই শেষ কথাটা একবার আপনার বড়দার মতো করে বলে শোনাতে পারেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়/ এতো কোনও শক্ত কাজ নয়।' মেজদার দিকে একপলক তাকিয়ে রঙ্গলাল সোজা গিয়ে শ্যামসুন্দরলালবাবুর চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'গেলি না গো, গেলি না গো!'

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান হয়ে গেলেন এসিজি। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

ঘরের সকলেই তো এসিজির কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক।

রঘুপতি অবাক সুরে বলল, 'স্যার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই চুট্‌কুলা ইয়াদ আয়া?'

কোনওরকমে হাসি থামিয়ে এসিজি বললেন, 'চুট্‌কুলা—মানে, চুটকিই বটে, রঘুপতি। আশা করি তোমার মিস্ট্রি সল্‌ভ হয়ে গেছে।' চুনিলালবাবুকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'একটা চিমটে এনে দিন। আপনার অমূল্য চুনি বোধহয় আমি খুঁজে দিতে পারব।'

কথাটা শোনামাত্রই রঙ্গলালবাবু তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন, হাতে একটা লম্বা চিমটে—যা দিয়ে অনায়াসে কোনও দৈত্যের মাথার পাকাচুল বাছা যায়।

রঙ্গলালের পিছু-পিছু যিনি এলেন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি গজেন্দ্রলাল। চুনিলালবাবু তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কীসব বলতে লাগলেন।

কিন্তু ততক্ষণে রঙ্গলালবাবুর হাত থেকে চিমটে নিয়ে স্টাফ করা পাখিগুলোর একটার কাছে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন অশোকচন্দ্র।

পাখিটা মাপে পায়রার চেয়ে ছোট। মেটে রঙের শরীরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। পেটের দিকটা সাদা। আর সরু লম্বা ঠোঁট।

এসিজি ওঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এই পাখিটার নাম কাদাখোঁচা। মাছ, শামুক-টামুক খায়। নাকি সুরে ডাকে। গ্রাম-বাংলার সব জায়গাতেই দেখা যায়। এটার ডান

চোখটা দেখুন— দেখেই বোঝা যায়, এটা নিয়ে কারিকুরি করেছে কেউ…।'

এসিজি কথা বলতে-বলতেই ডান চোখের পুঁতিটা খুঁচিয়ে তুলে চিমটে দিয়ে তার ভেতরটা আরও ভাল করে খোঁচাচ্ছিলেন।

হঠাৎই বেরিয়ে পড়ল হারানো চুনিটা। মেঝেতে ঠিকরে পড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর থামল।

ঘরের আলোয় ওটা লাল আভা ছড়িয়ে চিকচিক করতে লাগল।

একটা অস্ফুট শব্দ করে চুনিলালবাবু ছুটে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন লাল টুকটুকে পাথরটা। ওটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে আবেগ থরথর গলায় বললেন, 'মা তারা ব্রহ্মময়ী!'

তারপর পাথরটা শার্টের বুকপকেটে রেখে এসিজির হাত চেপে ধরলেন: 'মিস্টার গুপ্ত, আপনি দেবদূত হয়ে আজ আমাকে বাঁচালেন—।'

এসিজি হেসে বললেন, 'আমি নয়, আপনাকে বাঁচিয়েছেন রঙ্গলালবাবু। উনি ঠিকই বলেছেন। শ্যামসুন্দরলালবাবু মারা যাওয়ার সময় "পেলি না গো, পেলি না গো" বলেননি, উনি বলেছিলেন, "গেলিনাগো গেলিনাগো"। কথাটা বাংলা নয়—কাদাখোঁচা পাখির বৈজ্ঞানিক নাম। এই দেখুন, এই কার্ডে ইংরেজি আর ল্যাটিন নাম—দুটোই আছে।'

সকলে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল কার্ডে লেখা নাম দুটো:

Fantail Snipe (gallinago gallinago)

রঘুপতি যাদব এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানাল এসিজিকে: 'স্যার, য়ু আর এ জিনিয়াস!'

অশোকচন্দ্র নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সে শুধু তোমার মতে, রঘুপতি। নাও, এবার চলো—।'

রঙ্গলালবাবু এসিজির সামনে এসে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন।

আকর্ণ হেসে ছন্দে বললেন, 'প্রাচীন গ্রীসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টট্ল / আপনি আরও জ্ঞানী দুঁদে ব্যারিস্টট্ল।'

এসিজি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যারিস্টট্ল মানে!'

'ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান—' মাথা নামিয়ে বিনয়ের হাসি হাসলেন রঙ্গলালঃ 'কবিতার শেষটা মেলানোর জন্যে ব্যারিস্টার আর অ্যারিস্টট্লের সন্ধি করেছি—।'

আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

● ছাইয়ের আড়ালে ●

খুন-জখমের পক্ষে দিনটা মোটেই আদর্শ ছিল না।

শীতের সবে শুরু।

আকাশ মেঘলা, থমথমে, আর নির্জন—সেখানে একটিও পাখি উড়ছে না। প্রতিটি গাছের পাতা স্থির, চুপচাপ। সব মিলিয়ে প্রকৃতির সর্বাঙ্গে যেন অবসাদ আর ক্লান্তির ছাপ।

দোতলার ফ্ল্যাটের জানলার কাছে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে কীসব ভাবছিলেন অধ্যাপক অশোকচন্দ্র গুপ্ত—সংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি।

মেয়ে ঊর্মিলাকে অনেকদিন পর তিনি লম্বা চিঠি লিখতে বসেছেন। চিঠিতে 'লালমহল'-এর স্বভাবকবি রঙ্গলাল গোস্বামীর প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। এসিজি লিখেছেন : '…এই বিচিত্র কবি ভদ্রলোক কীভাবে আমার প্রশংসা করেন তার কয়েকটি নমুনা তোকে শোনাই। তুই তো আমাকে গোয়েন্দা বলে মনেই করিস না! অথচ এই ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে কী-কী বলেছেন শোন : "প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টটল / আপনি আরও জ্ঞানী দুঁদে ব্যারিস্টটল।" কিংবা "আমি আপনার গুণমুগ্ধ / আপনি যেন খাঁটি দুগ্ধ!" আবার "গোয়েন্দা, পক্ষিবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী / অমর, আকবর, এবং অ্যান্টনি।" আর সবশেষে দেখে আপনার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি / হলেম আমি নিহতবুদ্ধি।"

'আমি তোর বাবা বলেই তুই আমাকে গোয়েন্দা হিসেবে পাত্তা দিস না। নইলে…'

উইল্‌স ফিলটারে চোস্ত টান দিয়ে আপনমনেই হাসলেন অশোকচন্দ্র। ছোটবেলা থেকেই বরাবর ঊর্মিলাকে প্রশংসায় অবিচল

থাকার উপদেশ দিয়ে এসেছেন। অথচ আজ স্বভাবকবি রঙ্গলালের কথা বলতে গিয়ে, মেয়ের সঙ্গে চিঠিতে মজা করতে গিয়ে, সেইসব উদ্ভট ধরনের প্রশংসায় তিনি নিজেই অল্পসল্প তৃপ্তির আমেজ টের পাচ্ছেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন এসিজি।

যা ভেবেছেন তাই। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

'গুড মর্নিং, স্যার—রঘুপতি বলছি।'

'বলো— ।'

'মুড খারাপ করার জন্যে মাফ চাইছি। তবে ব্যাপারটা ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেম—ইসি লিয়ে আপকো ডিসটার্ব কর রহা হুঁ।'

'কেউ মারা গেছেন নাকি ?' কৌতূহলী হলেন এসিজি।

'হ্যাঁ। ওল্ড ম্যান পরমেশ্বর সরকার।'

'মার্ডার ?' মাথার সাদা চুলের গোছায় কয়েকবার টান মেরে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দা।

'সেটাই তো পারফেক্টলি ক্লিয়ার নয়। দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক।'

এসিজি একপলক আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি চলে এসো। আর রওনা হওয়ার আগে রঙ্গলালবাবুকে একটা ফোন করে দিয়ো। ওর ফোন নাম্বারটা লিখে নাও…।'

ফোন নম্বরটা বলার পর এসিজি যেন আপনমনেই মন্তব্য করলেন, 'লালমহলের রঙ্গলাল / দেখা হয়নি বহুকাল।'

তারপর ফোন রেখে দিয়ে ঊর্মিলার চিঠিটা শেষ করতে বসলেন।

হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই নতুন আর-একটা

সিগারেট ধরালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

কলিংবেলের শব্দটার মধ্যে রঘুপতির বাজানো চেনা সুর ছিল না। সুতরাং দরজা খুলতেই যে রঙ্গলাল গোস্বামীর মুখোমুখি হবেন সেটা এসিজি ভেবেই রেখেছিলেন।

পরনে হাফহাতা পাঞ্জাবি, ধুতি, আর হালকা বাদামী শাল। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুলের মাঝবরাবর সিঁথি। ছোট-ছোট চোখ, কপালের বাঁদিকে একটা ছোট আঁচিল। সামান্য ঘামে ভেজা মুখে প্রসাধনের ছাপ।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে রঙ্গলাল বললেন, 'বহুদিন পরে এলাম / গোয়েন্দাকে কবির সেলাম।'

রঙ্গলালের ঠিক পিছনেই ছিল রঘুপতি যাদব। প্রথম-প্রথম রঙ্গলালের আচরণে কিছুটা বিরক্ত হলেও এখন রঘুপতি ব্যাপারটা মানিয়ে নিয়েছে। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় এখন ও স্যারের মতো মজাই পায়।

ড্রইংরুমে তিনজনে গুছিয়ে বসামাত্রই রঘুপতি ওর কাজের কথা শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাক্তন ছাত্রকে বাধা দিলেন অশোকচন্দ্র। বললেন, 'রঘুপতি, আগে একটু আরাম করে কফি খাও, তারপর শুরু করো তোমার রাজধানী এক্সপ্রেস—।'

জানলার বাইরে শীতের সন্ধে নেমেছে। এসিজির ঠিকে কাজের লোক 'ললিতের মা' আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। তবে বছর তেরো বয়েসের 'কম্বাইন্ড হ্যান্ড' বিশু রয়েছে। একটু আগেই এসিজির জন্য দু-প্যাকেট সিগারেট এনে দিয়েছে ও। নিজের কাজের ঝক্কি কমাতে এসিজি ওকে কফি তৈরি করা শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন ওকে ডেকেই তিনকাপ কফির ফরমাশ করেছেন।

কফি খেতে-খেতে টুকটাক কথা হচ্ছিল। তারই মধ্যে রঙ্গলাল

গোস্বামী হঠাৎ জানালেন, ‘আমার একটা কবিতার বই বের করছি।’

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, ‘এ তো খুবই ভালো খবর। তা কবে বেরোচ্ছে বইটা?’

‘সামনের মাসের অমাবস্যায়। বইয়ের নাম দিয়েছি “স্বভাবকবিতাসমগ্র”।’

রঘুপতি যাদব জিগ্যেস করল, ‘হঠাৎ অমাবস্যায় রিলিজ করছেন কেন?’

রঙ্গলাল লাজুক হেসে বললেন, ‘আমি মা-কালীর একটু ইয়ে কিনা…। আমার স্বভাবকবিতার প্রথম বই…তাই ঈশ্বরের একটু-আধটু ইয়ে দরকার…।’

রঘুপতি মুচকি হেসে তাকাল এসিজির দিকে। এসিজি তখন কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বললেন, ‘ঈশ্বর এখন থাক। বরং পরমেশ্বরের কথা শুনি—পরমেশ্বর সরকার। বলো, রঘুপতি, শোনাও তোমার “বন্ধ ঘরের রহস্য”।’

রঘুপতি যাদব গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করল তার কাহিনী।

পরমেশ্বর সরকারের বাড়ি কেশব সেন স্ট্রিটে—আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায়। ওঁরা কয়েক পুরুষের বনেদী বড়লোক—রইস আদমি বলতে যা বোঝায় তাই। কলকাতা আর তার আশেপাশে ওঁদের প্রায় গোটা আটেক সিনেমা হল আছে। এ ছাড়া জমিজমা আর বাড়ির কোনও হিসেব নেই।

পরমেশ্বর সরকারের বয়েস হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর। ভদ্রলোক বিপত্নীক। তাঁর এক ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে অর্কদেবের বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে, বউয়ের নাম সুভদ্রা। ওঁদের বছর আট-দশের পিঠোপিঠি দুই ছেলে—তুতুন আর মিমো।

অর্কদেবের পরের বোনের নাম ঈশানী। বছর পনেরো আগে

বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশানী দিনসাতেক হল বাপের বাড়িতে এসে রয়েছেন।

পরমেশ্বরবাবুর ছোট মেয়ে হিমানীর বয়েস প্রায় চল্লিশ হবে। বিয়ে করেননি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সে এম. এসসি. করার পর সেখানেই ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণা করছেন।

ঘটনা ঘটেছে আজ সকালে।

দোতলায় পূর্বদিক ঘেঁষে পরমেশ্বরবাবুর পড়াশোনার ঘর। ঘরের লাগোয়া বড় বারান্দা। সেখানে আরামকেদারা আর টেবিল পাতা থাকে। পরমেশ্বরবাবু সেখানে বসে দিনের অনেকটা সময় কাটাতেন। কখনও চায়ের কাপ হাতে আয়েস করতেন, কখনও বা বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতেন।

আজ সকালে ন'টা নাগাদ অর্কদেব হঠাৎ দেখেন পরমেশ্বরবাবু তাঁর ঘরে একটা চেয়ারে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলে আধ কাপ চা, অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেট, আর তার পাশেই খানিকটা পোড়া ছাই।

বারান্দার দিকের কাচের জানলা দিয়ে অর্কদেব তাঁর বাবাকে ওই অবস্থায় দেখতে পান। কেমন যেন সন্দেহ হওয়ায় তিনি দরজার কাছে গিয়ে বাবাকে ডাকতে থাকেন। তারপর কোনও সাড়া না পেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেন।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত লোকজন জুটো করে অর্কদেব দরজা ভাঙতে বাধ্য হন। সে সময় দু-বোন তাঁর কাছেই ছিলেন।

ঘরের সব ক'টা জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সুতরাং ব্যাপারটা সহজ-সরল আত্মহত্যা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ডাক্তারি পরীক্ষায় চায়ের কাপে পোকামাকড় মারার বিষও পাওয়া গেছে। আর পোস্ট মর্টেমের প্রাথমিক খবর অনুযায়ী সরকার-সাহেবের পাকস্থলীতে ওই একই বিষের হদিস মিলেছে।

কিন্তু সবকিছু মিলে যাওয়া সত্ত্বেও একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, পরমেশ্বরবাবু সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে মারা গেছেন। অথচ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অর্কদেব-বাবুরা চায়ের কাপে সামান্য গরম চা পেয়েছেন। এ ছাড়া জ্বলন্ত সিগারেটের ব্যাপারটাও সমস্যা বাঁধিয়েছে।

এমনিতে পরমেশ্বরবাবু প্রায় দশ বছর হল ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কখনও-সখনও কাজের লোকদের দিয়ে এক-আধটা আনিয়ে খেতেন। অথচ সমস্যা হল, তাঁর ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও দেশলাই বা সিগারেট লাইটার পাওয়া যায়নি। আর শেষ সমস্যা ওই ছাই।

ধারাবিবরণী শেষ করে একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটুতে চাপড় মারল রঘুপতি, বলল, 'এইজন্যেই স্যার আপনাকে ফোনে বলেছি, মার্ডার না সুইসাইড ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক—।'

এসিজি রোগা শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে হাতের ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটের টুকরোটাকে টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। সামান্য হেসে প্রশ্ন করলেন, 'সুইসাইড বা মার্ডার যা-ই হোক, কেসটা তোমার কাছে গেল কেমন করে?'

তেতো হাসল রঘুপতি। তারপর বৃদ্ধ হুজুরের চোখে তাকিয়ে বলল, 'সিরফ্ আপকে লিয়ে, স্যার।'

এসিজি অবাক হয়ে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকালেন: 'আমার জন্যে! তার মানে? ঠাট্টা করছ?'

হাসল রঘুপতি যাদব, বলল, 'আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ও. সি. বিজন শর্মা আমার খুব বন্ধু। আমার কাছে ও আপনার কথা অনেক শুনেছে। আপনার পিকিউলিয়ার ইন্টারেস্টের কথা ও জানে। তাই পি. এম. রিপোর্টের খবর পাওয়ামাত্রই আমাকে ফোন

করে সব জানিয়েছে। আপনি চাইলে কাল আমরা পরমেশ্বর সরকারের বাড়ি ভিজিট করতে পারি। অব আপকি মরজি— ।'

রঙ্গলালবাবু এতক্ষণ চুপটি করে বসে রঘুপতির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এখন হঠাৎই সক্রিয় হয়ে এসিজিকে অনুরোধের সুরে বললেন, 'অবশ্যই যেতে হবে গোয়েন্দাপ্রবর / সুইসাইড না মার্ডার—রহস্য জবর।'

দু-হাতের দশ আঙুল মাথায়-মাথায় ঠেকালেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক সেকেন্ড আপনমনে কী যেন ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে রঘুপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাব তো নিশ্চয়ই, তবে তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

রঘুপতি ব্যাজার মুখ করে বলল, 'মাফ করনা, গুপ্তাসাব। আপনার যা কিছু কোয়েশ্চেন আছে সব কাল শর্মাকে করবেন। ও অনেক বেটার উত্তর দিতে পারবে। আমি বরং ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। যদি বলেন, কাল আমি আর ও আপনার এখানে চলে আসব। তারপর একসঙ্গে স্টার্ট দেব— ।'

অশোকচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'তুমি শর্মাকে নিয়ে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে এখানে চলে এসো। কারণ, আমি আটটা থেকে ন'টার মধ্যে পরমেশ্বরবাবুর ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই।'

এসিজির কথায় রঘুপতি তেমন একটা ভরসা পেল না। অস্পষ্ট স্বরে ও বলল, 'শর্মা তো সব ছানবিন করে দেখেছে। আপনি কি আর নতুন কিছু পাবেন ?'

রঘুপতির কথায় অশোকচন্দ্র হাসলেন। মাথার সাদা চুলের গোছায় বারকয়েক টান মেরে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, রঘুপতি ? তুমি জানো, তোমার ওই শর্মাকে দিয়ে যা হবে না তা এই শর্মাকে দিয়ে হতেও পারে—তাই না ? ঠিক আছে, তুমি যাতে হতাশ না হও সে-চেষ্টা আমি করব। নাউ চিয়ার আপ। এসো, একটু জমিয়ে গল্প করা যাক।'

রঙ্গলাল গোস্বামী হাতে হাত ঘষে বললেন, ‘এসিজি স্যার, একটা কথা বলব ?’

‘নিশ্চয়ই—বলুন।’

চোখ নামিয়ে সংকুচিতভাবে রঙ্গলাল বললেন, ‘যাতে কথাটা মোলায়েম শোনায় তাই স্বভাবকবিতায় বলছি। অকুস্থলে তিনজন মহা অনাচার / রঙ্গলাল সঙ্গী হলে সংখ্যা হবে চার। এর ইনার মিনিংটা বুঝতে পারলেন, স্যার ?’

অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, ‘বুঝতে পেরেছি। কাল সকালে তিনজন নয়, চারজন একসঙ্গে রওনা হব। তা না হলে আপনি আমার তদন্তরসে বঞ্চিত হবেন, আর আমরা বঞ্চিত হব আপনার কাব্যরস থেকে। এবার আপনার কয়েকটা কবিতা শোনান দেখি— ।’

‘কবিতা নয়—স্বভাবকবিতা।’ এসিজিকে শুধরে দিলেন রঙ্গলাল।

বাড়িটার নাম ‘সরকারভিলা’ শুধু নামে নয়, কাজেও।

প্রায় আট কাঠা জায়গা জুড়ে তিনতলা বাড়ি, আর লাগোয়া ছোট বাগান। বাড়িটার রঙ হালকা সবুজ। তবে বারান্দা আর জানলায় গাঢ় সবুজের বর্ডার দেওয়া।

সদরের বিশাল লোহার গেট খুলে দিল উর্দি পরা দারোয়ান। এসিজি, বিজন শর্মা, রঘুপতি যাদব আর রঙ্গলাল গোস্বামী ভেতরে ঢুকলেন।

সামনেই শান বাঁধানো বিশাল চাতাল। সেখানে দুটো নাদুস-নুদুস বাচ্চা ছেলে লাল রঙের একটা বল নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। ওদের বয়েস আট-দশ বছর হবে। পরনে টি-শার্ট, সোয়েটার আর হাফ প্যান্ট।

দারোয়ানের প্রশ্নের উত্তরে বিজন শর্মা বলেছেন যে, ওঁরা অর্কদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান। দারোয়ান তখন ইশারা করে

বাঁদিকের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

বাড়িটা সদর দরজার বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বাড়ি আর উঠোন পেরোলেই শুরু হয়ে গেছে বাগানের এলাকা। সদরের কাছ থেকেই বাগানের বেশ কয়েকটা গাছের মাথা নজরে পড়ছিল।

বাঁদিকের দরজা লক্ষ করে এগোতেই ডানপাশে গ্যারেজ চোখে পড়ল। সেখানে একটা মারুতি জেন, আর একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে।

মার্বেল পাথর বাঁধানো দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠলেই বড় মাপের ভারি কাঠের দরজা। যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখেই অর্কদেব সরকার বলে মনে হল এসিজির।

টকটকে ফরসা গায়ের রং। পরনে সামান্য লাট হয়ে যাওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি। তার ওপরে একটা সাদা শাল জড়ানো। চোখে চশমা। মুখের চামড়ায় বয়েসের ভাঁজ পড়েছে। কাঁচা-পাকা চওড়া গোঁফ, জোড়া ভুরু, চোখের তারায় কটা ভাব, মাথার এলো-মেলো চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে।

বিজন শর্মা সৌজন্যের হাসি হেসে বললেন, 'নমস্কার অর্কদেব-বাবু। কাল রাতে আপনাকে তো ফোন করে বলে রেখেছিলাম। ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত আপনার বাবার…মানে…উইলের ব্যাপারে আমাদের একটু হেল্প করতে এসেছেন—।'

চঞ্চল চোখ ঘুরিয়ে অর্কদেব তাকালেন এসিজির দিকে: 'আপনি ডাক্তার?'

মাথার চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে এসিজি বললেন, 'হ্যাঁ —লেখাপড়ার ডাক্তার। আরও ভালো করে বলতে গেলে— ফিজিক্সের ডাক্তার।'

অর্কদেব অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন, বললেন, 'সরি, কিছু মনে করবেন না। আসুন, ভেতরে আসুন বসুন।'

ওঁরা চারজন বসবার ঘরে ঢুকলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা যেন পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেল।

ঘরের মেঝেতে চকচকে ইটালিয়ান মার্বেল পাথর বসানো। ডানদিকে পুরনো ধাঁচের কারুকাজ করা ডিভান—বোধহয় মেহগনি কাঠের তৈরি। সোফা সেটি যেন কারুকাজ করা ছোটখাটো সিংহাসন। ডিভানের পাশে দাঁড় করানো প্রায় আলমারির মাপের এক বিচিত্র পিতামহ-পেন্ডুলাম-ঘড়ি। তার নকশা কাটা পেন্ডুলামের সামনে ঝুলছে তিনটে পিতলের চোঙ। ঘণ্টি বাজানোর কাজটা বোধহয় ওরাই করে।

বাঁদিকে জানলার কাছে একটা সুদৃশ্য টেবিলে রাখা আছে দুটো টেলিফোন—একটা পুরনো ধাঁচের, আর-একটা আধুনিক। সিলিং থেকে ঝোলানো রয়েছে সিলিং পাখা। তবে নজর করে দেখলে সেখানে ব্রিটিশ আমলের হাতে টানা পাখার আংটাও চোখে পড়ে।

সোফায় বসে অশোকচন্দ্র ঘরটাকে জরিপ করে দেখছিলেন।

এখানে আসার পথে ও. সি. বিজন শর্মা আর রঘুপতি যাদবের কাছে যা-যা শুনেছেন তাতে সরকাররা লাখপতি নয়, কোটিপতি। ওঁরা প্রায় চার পুরুষের ধনী।

পোস্ট মর্টেমের পর পরমেশ্বরবাবুর মৃতদেহ এখনও অর্কদেবরা হাতে পাননি। বিজন শর্মা সামান্য অপরাধী-সুরে জানালেন, ডেডবডি পেতে-পেতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে।

অর্কদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের কোণ মুছে নিলেন, বললেন, 'আমাদের যা-কিছু দেখছেন সবই বাবার দান। বাবাকে আমরা সবাই খুব শ্রদ্ধা-সমীহ করতাম। হঠাৎ কেন যে উনি সুইসাইড করলেন···যদিও কিছুদিন ধরে ডিপ্রেশানে ভুগছিলেন।'

শর্মা একটু গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর সকলের সঙ্গে অর্কদেবের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'ওই সুইসাইডের ব্যাপারটা নিয়েই খানিকটা গোলমাল থেকে গেছে।

সেইজন্যেই ডক্টর গুপ্তকে রিকোয়েস্ট করে নিয়ে এসেছি— ।'

'গোলমাল! কীসের গোলমাল?' শোকের মধ্যেও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন অর্কদেব।

রঘুপতি ভুরু কুঁচকে অর্কদেবকে দেখছিল। এসিজি বুঝতে পারলেন, ও যদি সরাসরি এই কেসের দায়িত্বে থাকত তা হলে এখনই হয়তো রুক্ষভাবে কিছু বলে বসত।

বিজন শর্মা শান্তভাবে নরম গলায় বললেন, 'মিস্টার সরকার, আপনার বাবার ঘরের দরজা-জানলা ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ ছিল। সেই অবস্থায় টেবিলে জ্বলন্ত সিগারেট আর কাগজ-পোড়া ছাই পাওয়া গেল—অথচ ঘরের কোথাও দেশলাই কিংবা লাইটারের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য দেশলাই কি লাইটার পাওয়া গেলেও আমাদের সন্দেহ থেকে যেত ওই সিগারেট পরমেশ্বরবাবু আদৌ ধরিয়েছেন কি না। কারণ, উনি মারা গেছেন সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে, অথচ সিগারেটটা ন'টার সময়েও জ্বলছিল। সুতরাং অন্য কেউ নিশ্চয়ই ওই সিগারেট ধরিয়েছে, কাগজ পুড়িয়েছে। কিন্তু··· ।'

শর্মার কথার খেই ধরে রঘুপতি বলল, 'লেকিন অওর কোই যদি সিগারেট জ্বালাবে তো সে দরওয়াজা-খিড়কি বন্ধ করে ঘর থেকে পালাবে কেমন করে?'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত অর্কদেব সরকারের অনুমতি দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। সেটায় গভীর টান দিয়ে আমেজে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'সুইসাইড হোক বা হোমিসাইড হোক, তাতে আপনার তো কোনও প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, অর্কদেববাবু!'

'না, তা নয়···তবু··· ।'

রঙ্গলাল গোস্বামী এই প্রথম মুখ খুললেন, 'আসলে এসিজি স্যার জানতে চান: সুইসাইড, না হোমিসাইড / খাঁটি গোল, না

সেমসাইড।'

অর্কদেব অবাক হয়ে রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাইরের উঠোনে বাচ্চা দুটো 'গোল! গোল!' করে প্রবল চিৎকার করছিল। অর্কদেব বিরক্ত হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে গেলেন জানলার কাছে। চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, 'তুতুন! মিমো! কী হচ্ছে! গোলমাল কোরো না—এখানে আমি গেস্টদের সঙ্গে কথা বলছি।'

সাময়িকভাবে বাচ্চাদুটোর চেঁচামেচি কমে গেল।

এসিজি অর্কদেবকে বললেন, 'আমি আপনার বাবার ঘরটা একবার দেখব।'

পেন্ডুলাম-ঘড়িতে মিষ্টি সুরে সাড়ে আটটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই কোথা থেকে একটা বড়সড় মাপের কানঝোলা লোমওয়ালা কুকুর ঘরে এসে ঢুকল। কুকুরটার গায়ের রং উজ্জ্বল হলদে-বাদামী। সামান্য লেজ নেড়ে কুকুরটা অর্কদেব সরকারের পায়ের কাছে গা ঘষতে লাগল।

এসিজি কুকুরটার জাত চিনতে পারলেন: গোল্ডেন রিট্রিভার।

অর্কদেব কুকুরটাকে 'টমি! টমি! গো।' বলতেই ওটা গম্ভীর চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এসিজিকে উদ্দেশ করে অর্কদেব বললেন, 'চলুন, ওপরে চলুন। মিস্টার শর্মা তো ঘরটা সিল করে রেখে গেছেন—।'

বিজন শর্মা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। চলুন, খুলে দিচ্ছি।'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে মার্বেল পাথরের খাটো স্তম্ভ। সেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে পালিশ করা কাঠের মসৃণ রেলিং।

মার্বেল পাথরের ধাপে পা ফেলে ওঁরা ওপরে উঠতে যাবেন, ঠিক তখনই তুতুন আর মিমো ছুটে চলে এল ওঁদের কাছে।

বয়েসে সামান্য ছোট ছেলেটি বল আঁকড়ে ধরে লুকিয়ে পড়তে

চাইল অর্কদেবের পিছনে। একইসঙ্গে অনুযোগের সুরে বলল, 'দ্যাখো না বাপি, দাদা আমার থেকে বল কেড়ে নিচ্ছে।'

বড়জন প্রতিবাদে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, অর্কদেব তাকে ধমক দিয়ে থামালেন : 'তুতুন, কেন এরকম অসভ্যতা করছ! বলো তো, ওঁরা কী ভাববেন!'

তারপর এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দুই ছেলে ...ভীষণ দুরন্ত... ।'

এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাচ্চা দুটোকে বললেন, 'তোমাদের দুজনকে একটা ইন্টারেস্টিং ধাঁধা দিই—সল্‌ভ করতে পারলে প্রাইজ পাবে।'

এ-কথা শুনেই গোলগাল দু-ভাই ঝগড়া ভুলে এসিজির কাছে চলে এল।

এসিজি বললেন, 'বলো তো, একটা মশা আর একটা মাছির লড়াই হলে কে জিতবে?'

সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে হাঁ করে ভাবতে শুরু করল।

এসিজি হেসে ওদের বললেন, 'উত্তরটা ভেবে পেলেই আমাকে বলে যাবে—আমি দোতলায় তোমাদের ঠাকুরদার ঘরে আছি।'

ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন।

অশোকচন্দ্রের প্রশ্নটা শোনার পর থেকেই রঙ্গলাল গুম হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। সেই ভাবুক ভাবটা বজায় রেখেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রশ্নটা বড় কঠিন, বড় ইন্টারেস্টিং / মশা জেতে, নাকি মাছি, করিলে ফাইটিং।'

বিজন শর্মা আর অর্কদেব অবাক হয়ে রঙ্গলালকে দেখলেন। অর্কদেবের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসিও দেখা গেল।

প্রাচীন বিলাসবহুল বাড়িটার প্রতিটি অংশই এসিজিকে মুগ্ধ করছিল। দোতলায় উঠতে উঠতে তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন এইবার বোধহয় একটা বড়সড় পাখির খাঁচা দেখতে পাবেন, অথবা

দাঁড়ে বসা অস্ট্রেলিয়ার অপূর্ব কাকাতুয়া।

কিন্তু এসিজিকে হতাশ হতে হল। তবে অর্কদেবকে জিগ্যেস করে জানতে পারলেন, তিনতলার ছাদে পাখির খাঁচা একটা ছিল—দেশি-বিদেশি বহু পাখিও ছিল সেখানে। কিন্তু কী এক মড়ক লেগে রাতারাতি সব পাখি মারা যায়। তারপর থেকে পরমেশ্বর আর পাখি পোষেননি।

দোতলায় উঠে পরমেশ্বর সরকারের ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে মহিলা-কণ্ঠের কথা শোনা গেল। তায় একটু পরেই চওড়া বারান্দার লাগোয়া একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দুজন ভদ্রমহিলা।

একজনের সিঁথিতে সিঁদুর। ফরসা মোটাসোটা ভারি চেহারা। চোখে চশমা। পরনে গোলাপী তাঁতের শাড়ি। বয়েস পঁয়তাল্লিশের এদিক-ওদিক হবে।

রঘুপতি যাদব আর বিজন শর্মার কাছে বিশদ বিবরণ যা শুনেছেন তাতে এসিজি অনুমান করলেন ইনি পরমেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে ঈশানী মজুমদার।

দ্বিতীয় মহিলার রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরনে হালকা রঙের আধুনিক নকশা কাটা শাড়ি। চোখে মানানসই চশমা। এখন চল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও বেশ সুন্দরী। তবে চোখে মুখে চোয়ালে কেমন একটা একরোখা উদ্ধত ভাব। মনে হয় ইনি নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত, নিতে নয়।

পরমেশ্বর সরকারের ছোট মেয়ে হিমানী সরকার। মনে-মনেই যেন আওড়ালেন এসিজি।

পরমেশ্বরবাবু মারা যাওয়ার ফলে তিন ছেলেমেয়েই সরাসরি বিশাল বড়লোক হয়ে যাবেন। বৃদ্ধ যদি সত্যি-সত্যিই খুন হয়ে থাকেন তা হলে এই তিনজনের মধ্যেই খুনী লুকিয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে ওঠার জন্য খুনী ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন?

পরমেশ্বর সরকার যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছিলেন। আর বছরকয়েক অপেক্ষা করলে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো তাঁর মৃত্যু হত। তা হলে··· ।

অর্কদেব, ঈশানী আর হিমানীকে দেখে ওঁদের কাউকে খুনী বলে ভাবতে বেশ কষ্ট পেলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তুতুন আর মিমোর কথা মনে পড়ল তাঁর। বাপি অথবা পিসিদের একজনকে ঠাকুরদার হত্যাকারী হিসেবে মেনে নিতে কী কষ্টই না হবে ওদের! নেহাত বয়েস কম বলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা ততটা বুঝে উঠতে পারবে না।

নাঃ, খুন যেমন জঘন্য কাজ তেমনই খুনী খুঁজে বের করার কাজটাও জঘন্য।

পরমেশ্বর সরকারের ঘরের কাছে এসে বিজন শর্মা সিল ভেঙে ঘরের তালা খুলে দিলেন।

অর্কদেব, হিমানী ও ঈশানীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ওঁরা চারজন ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

ঘরে ঢুকেই রঙ্গলালবাবু নাক কুঁচকে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন কয়েকবার।

অশোকচন্দ্র অবাক হয়ে স্বভাবকবির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল?'

চোখে সবজান্তার দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে রঙ্গলাল বললেন, 'অন্তরীক্ষ, জল, স্থল / সবার ওপরে অকুস্থল।'

বিজন শর্মা আর রঘুপতি ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর রঘুপতি আঙুল তুলে পুবদিকের কাচের জানলার কাছে রাখা একটা বড় মাপের টেবিল দেখিয়ে মন্তব্য করল, 'পরমেশ্বরবাবু ওই টেবিলে বসেছিলেন···।'

বিজন শর্মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শুধু টেবিল নয়, গোটা ঘরটাকেই জরিপ করে দেখছিলেন

অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

পুরনো সময়ের ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। চেয়ার, টেবিল, ছোট মাপের পেন্ডুলাম দেওয়াল-ঘড়ি, আলমারি, আর বইয়ের র‍্যাক —সবকিছুর গায়েই সেই পরিচয়ের সিলমোহর। বইয়ের র‍্যাকের অসংখ্য বই জানিয়ে দেয় পরমেশ্বর পড়ুয়া লোক ছিলেন।

জানলার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন এসিজি।

কাচের জানলাটা প্রায় চার ফুট বাই চার ফুট। জানলা বন্ধ ছিল।

জানলার বাইরেই চওড়া বারান্দা। সেখানে একটা টেবিল আর ইজিচেয়ার রয়েছে। ওই চেয়ারে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকার আর কখনও শরীর এলিয়ে বিশ্রাম নেবেন না সেটা ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হল এসিজির। পুরনো আসবাবগুলো রয়ে গেছে, শুধু পুরনো মানুষটা চলে গেছে।

বারান্দায় সকালের রোদ এসে পড়েছিল। কাচের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে পরমেশ্বরের ঘরের টেবিলেও। টেবিলের ঝকঝকে পালিশ করা কাঠ সেই রোদের প্রতিবিম্ব ছিটকে দিয়েছে ঘরের দেওয়ালে।

হাতঘড়ি দেখলেন এসিজি। প্রায় পৌনে ন'টা। সূর্য যত ওপরে উঠবে টেবিলের রোদ ততই সরে যাবে জানলার দিকে। এখন টেবিলের মাত্র সিকিভাগ রোদের আওতায় রয়েছে। আরও আধঘণ্টা আগে নিশ্চয়ই বেশি ছিল।

টেবিলে একটা পাথরের তৈরি অ্যাশট্রে পড়ে ছিল। হাতের ছোট হয়ে আসা সিগারেটটা কী করে যেন নিভে গিয়েছিল। সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অশোকচন্দ্র ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেন, 'এটা পরমেশ্বরবাবুর অ্যাশট্রে?'

বিজন শর্মার কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ দেখা যাচ্ছিল। হয়তো বুঝতে চাইছিলেন রঘুপতি যাদবের প্রাক্তন স্যার এই বৃদ্ধ হনুর তদন্ত করে নতুন আর কোন তথ্য আবিষ্কার করেন। এসিজির প্রশ্নে

তটস্থ হয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, একই অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রের খাঁজে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটা আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম। ফোরেনসিক রিপোর্ট বলছে, সিগারেটের ফিলটারের দিকে ঠোঁটের চাপের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হয়তো খেয়ালবশে পরমেশ্বর সরকার সিগারেটটা ধরিয়েছিলেন, তবে খাননি। খোঁজ করে জেনেছি, উনি গত পরশু একজন কাজের লোককে দিয়ে একটা সিগারেট আনিয়েছিলেন। হয়তো কাল সকালে সেটাই ধরাবেন বলে ভাবছিলেন।'

এসিজি মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'হুঁ—কিন্তু ধরাননি।'

'কাগজ-পোড়া ছাইটা ওই জায়গায় ছিল—' অ্যাশট্রের কাছাকাছি চক দিয়ে দুটো 'ক্রস' চিহ্ন দেওয়া ছিল। তারই একটা দেখিয়ে বিজন শর্মা বললেন।

তখন রঘুপতি অন্য 'ক্রস' চিহ্নটা দেখিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ওইখানে তা হলে চায়ের কাপ ছিল…।'

এসিজি লক্ষ করলেন, অ্যাশট্রে এবং চকের মার্কা দেওয়া জায়গা দুটো রোদের বেশ কাছাকাছিই রয়েছে। একটু আগেই হয়তো ওখানে রোদ পড়েছিল।

রঘুপতি কী যেন ভেবে ইতস্তত করে বলল, 'গুপ্তাসাব, রোদ পড়ে চা গরম হয়ে যায়নি তো!'

অশোকচন্দ্র তারিফের নজরে ফিরে তাকালেন রঘুপতির দিকে, বললেন, 'ভালো বলেছ। গুড ডিডাকশান। কিন্তু সিগারেটে আগুন ধরল কী করে, আর কাগজ পুড়ে ছাই হল কী করে?'

'সেটাই তো আমি কাল থেকে ভাবছি।' ব্যাজার মুখে মন্তব্য করলেন শর্মা।

টেবিলটাকে ঘিরে বারকয়েক পাক খেলেন এসিজি। একইসঙ্গে তিনি কাচের জানলার দিকে দেখছিলেন। হঠাৎই তিনি বিজন শর্মাকে লক্ষ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'জানলার লকটা ভালো করে

চেক করেছেন তো ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজন শর্মা। তারপর শ্রান্ত গলায় বললেন, 'চেক করেছি মানে! কাল এক চাবিওয়ালাকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে এসেছিলাম। সে জানলা-দরজা সব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছে। তারপর স্পষ্ট বলেছে, কোনও অবস্থাতেই জানলা দরজার ছিটকিনি বাইরে থেকে খোলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কেউ যে ঘর থেকে বাইয়ে বেরিয়ে কায়দা করে জানলা বা দরজা টেনে দিয়ে ভেতরের ছিটকিনি আটকে দেবে, তাও অসম্ভব। সুতরাং বুঝতেই পারছেন....।'

রঘুপতি হেসে বলল, 'লক্‌ড রুম পাজ্‌ল···আপনার ফেভারিট, স্যার।'

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন এসিজি, পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে নতুন আর-একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে আরও একবার ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঘরটার মাপ বড়জোর দশ বাই দশ। ঘরে দুটো একই মাপের জানলা ঃ একটা পূবদিকের দেওয়ালে, আর-একটা দক্ষিণে——দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকটায়। দুটোই কাচের জানলা, তার ওপরে পরদা টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জানলা দুটোর ছিটকিনি ভেতর থেকে আঁটা। ঘরের একটিমাত্র দরজা, ভারি কাঠের তৈরি, তবে তার ছিটকিনিটা ভাঙা। গতকাল এই সময়ে অর্কদেবরা ধাক্কা দিয়ে ছিটকিনি ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন। ঘরের আসবাবপত্র বলতে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, একটা টিভি, আর চারটে বইয়ের র‍্যাক।

বিজন শর্মার কাছেই অশোকচন্দ্র শুনেছেন ঘরটা পরমেশ্বরবাবুর পড়াশোনার আর বিশ্রামের ঘর ছিল। দোতলার কোণের দিকে তাঁর শোওয়ার ঘর। রোজ ঘুম থেকে উঠেই তিনি এ-ঘরে চলে আসতেন। সকালের রোদ টেবিলে রেখে চা খেতেন, বই পড়তেন, ছেলেমেয়েরা বা অন্য কেউ কথা বলতে এলে এ-ঘরে বসেই সেইসব

কথাবার্তা সারতেন।

কিছুদিন ধরে পরমেশ্বরবাবু নাকি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির অনেকটা অংশ রামকৃষ্ণ মিশন বা ওইরকম কোনও প্রতিষ্ঠানে দান করে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এমন কী ফোন করে উকিলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তাও নাকি বলেছিলেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে—কিছুদিন ধরেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি তর্ক-বিতর্ক চলছিল। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা তাঁকে গুরুজন হিসেবে ছিটেফোঁটাও গুরুত্ব দেয় না। এ-কথা তিনি প্রায়ই চিৎকার করে বলতেন। দু-নাতির কাছেও এ-নিয়ে আক্ষেপ করতেন। কখনও-কখনও নাকি কান্নাকাটিও করতেন। বাড়ির কাজের লোকরা সব শুনেছে।

ঘরটা দেখতে-দেখতে বিজন শর্মার কথাগুলো মনে পড়ছিল এসিজির।

তা হলে ডিপ্রেশানের শিকার হয়ে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকার সত্যি-সত্যিই সুইসাইড করেছেন? নাকি ব্যাপারটা খুন…আর রঘুপতি যাদবের কথামতো 'দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক'!

কিন্তু খুনই যদি হবে, তা হলে দরজা-জানলার ছিটকিনি ভেতর থেকে এঁটে দিয়ে খুনী ঘর থেকে পালাল কেমন করে?

এইসব ভাবতে-ভাবতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন এসিজি। কার্বন ফ্রেমের চশমাটাকে সামান্য নেড়েচেড়ে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন।

রঙ্গলাল গোস্বামী বইয়ের র‍্যাকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলেন। হঠাৎই একটা বই তাক থেকে টেনে নিয়ে তিনি চলে এলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দার কাছে। বইটা এসিজির মুখের কাছে ধরে বললেন, 'এই পুস্তকটি লক্ষ্যণীয়, এসিজি স্যার।'

এসিজি বইটার দিকে তাকালেন। জেমস্ হিলটনের লেখা

গোয়েন্দা উপন্যাস 'ওয়াজ ইট মার্ডার ?' ১৯৩১ সালে গ্লেন ট্রেভর ছদ্মনামে লেখা।

সামান্য হেসে রঙ্গলালের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, স্বভাবকবিবর, আমি এখন এই প্রশ্নটা নিয়েই ভাবছি।'

রঙ্গলাল একটু ইতস্তত করে বইটা আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে এলেন।

রঘুপতি স্যারকে লক্ষ করছিল। ও আলতো গলায় জিগ্যেস করল, 'অন্ধকারে কোনও রোশনি চোখে পড়ল, স্যার ?'

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের দিকে ফিরে অনেকটা যেন আপনমনেই বললেন, 'সেটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা, এমন যদি হয়, ধরো, খুনী বিষ মেশানো চা-টা পরমেশ্বর সরকারকে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তারপর পরমেশ্বরবাবু দরজা-জানলা সব ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন, এবং বিষাক্ত চা খেয়ে মারা গেলেন। তখন—'

বিজন শর্মা এসিজিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তাতে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে চারটে ব্যাপার ঃ গরম চা, জ্বলন্ত সিগারেট, কাগজ পোড়া ছাই, আর—'

'ঘরের ভেতরে নো দেশলাই—' শর্মাকে বাধা দিয়ে ছন্দে পাদ-পূরণ করলেন রঙ্গলাল।

'ব্যাপারটা মার্ডার বলে ভাবতে চাইলে যে-সমস্যা, সুইসাইড বলে ভাবলেও সেই একই। মানে, প্রবলেমের সেকেন্ড পার্টটা থেকেই যাচ্ছে।' অপনমনে বললেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত, 'তা হলে সেকেন্ড পার্টটাই প্রথমে সল্‌ভ করার চেষ্টা করে দেখি।'

রঘুপতি তার স্যারের কথায় হেসে বলল, 'আপনার যা মরজি।'

এসিজি আনমনাভাবে সিগারেটে টান দিয়ে চললেন, আর একইসঙ্গে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বৃদ্ধ পরমেশ্বর সরকারকে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। ছেলেমেয়েদেয় ওপরে তিতিবিরক্ত মানসিক

অবসাদে ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষটি কি সত্যই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ? নাকি বৃদ্ধ পিতার ওপরে তিতিবিরক্ত তিন ছেলেমেয়ের কেউ রাগের মাথায় একটা জঘন্য কাজ করে ফেলেছে ?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, সিগারেট ধরিয়ে কাগজ পোড়ানোর পর সেই আগুনে পরমেশ্বরবাবু দেশলাইটাকেও পুড়িয়ে ফেলেছেন ! অথবা, দেশলাই বা লাইটারটাকে কারও হাত দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিংবা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জানলা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন !

তাই যদি হবে, তা হলে উনি মারা যাওয়ার কম করে একঘণ্টা পরেও চা কী করে গরম ছিল, আর সিগারেটই বা কেমন করে জ্বলছিল ।

এত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়েও বিষয়গুলো রঘুপতি আর শর্মার সঙ্গে আলোচনা করলেন এসিজি । এবং যথারীতি চা আর সিগারেটের সমস্যায় এসে ধাক্কা খেলেন ।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তেই তা হলে পৌঁছতে হয় যে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ হওয়ার পর বাইরে থেকে চা-সিগারেটের ব্যাপারটা করা হয়েছে । অথচ আপাতভাবে কাজটা অসম্ভব ।

নিজের ওপরে যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েই ঘরের বাইরে চলে এলেন বৃদ্ধ হুনুর ।

অর্কদেব ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন । আত্মীয়স্বজন কয়েকজন চলে এসেছেন বাড়িতে । পরমেশ্বরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বলতে একমাত্র নিস্তব্ধতা । সকলেই বেশ নিচু গলায় কথা বলছিলেন ।

বিজন শর্মা এসিজির পিছন-পিছন বেরিয়ে এসেছিলেন । তিনি এসিজিকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি অর্কদেব, ঈশানী বা হিমানীর সঙ্গে কথা বলতে চান ?'

এসিজি আলতো হেসে বললেন, 'নতুন আর কী জিগ্যেস করব !

যা জানার আপনার কাছেই তো জেনে গেছি। বন্ধ ঘরের রহস্য ভেদ করতে পারলেই বাকি সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে।'

রঘুপতি যাদবের কথা মনে পড়ল আবার : 'দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক— ।'

কিন্তু কী সেই ট্রিক, কী সেই কৌশল ?

এইসব ভাবতে-ভাবতে পুব দিকের বারান্দায় চলে এলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। সকালের রোদ সরতে-সরতে এখন পরমেশ্বরের ঘরের বাইরে, বারান্দার মেঝেতে। মেঝেতে পড়ে থাকা রোদের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন।

বারান্দার নীচেই বাগান। বাগানে অনেক সবুজ। রোদ পড়ে মসৃণ পাতাগুলো চিকচিক করছে। ছোট হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা বাগানের দিকে ছুড়ে দিলেন এসিজি।

বাগানে নিয়মিত পোকামাকড় মারার ওষুধ দেওয়া হয়। সেই ওষুধই কেউ মিশিয়ে দিয়েছে পরমেশ্বরের চায়ের সঙ্গে। সকালে একসঙ্গে সকলের চা তৈরি হয়েছে। কাজের লোকরাই চা ভাগ করে যার-যার ঘরে পেঁীছে দিয়েছে। চা খাওয়ার সময় অর্কদেব একবার বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। তাতে বৃদ্ধ পরমেশ্বর বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। গতিক সুবিধে নয় দেখে অর্কদেব চলে এসেছিলেন ঘর থেকে।

অর্কদেবকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন বিজন শর্মা।

অর্কদেব ঘটনাটা অস্বীকার করেননি। তিনি যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই : ব্যারাকপুরে ওঁদের তিনটে সেকেলে ধাঁচের সিনেমা হল আছে। অর্কদেবের ইচ্ছে, দুটো হল বিক্রি করে সেই টাকায় অন্য সিনেমা হলটাকে ভোল পালটে একেবার আধুনিক করে তোলেন। এ-ব্যাপারে তিনি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও এগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু পরমেশ্বর সরকার বেঁকে বসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সেকেলে হলেই কি যে-কোনও জিনিস বিক্রি করে দিতে

হবে ! তারপর সিগারেট খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে অর্কদেবের একটু কথাকাটাকাটি হয় ।

সম্পত্তি থাকলে ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে। কিন্তু তার জন্য এতবড় দুঃসাহসী কাজ কি অর্কদেব বা অন্য কেউ করতে পারেন ! যদিও বা করে থাকেন তা হলে কীভাবে ? তার ওপর গরম চা আর জ্বলন্ত সিগারেটের জট তো আছেই !

চুলের গোছায় টান মেরে চোখ থেকে কার্বন ফ্রেমের চশমাটা খুলে নিলেন এসিজি। সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের গাছপালা তাঁর চোখে কিছুটা ঝাপসা হয়ে গেল। যে চোখ থাকতেও ভালো করে দেখতে পায় না তার ঝাপসা দেখাই ভালো—নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে ভাবলেন এসিজি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকালেন পরমেশ্বরবাবুর ঘরের জানলার দিকে। কাচের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে রঘুপতি, বিজন শর্মা ও রঙ্গলাল গোস্বামীকে দেখা যাচ্ছে। ওঁরা ঘরের ভেতরে ঘোরাঘুরি করছেন।

হঠাৎই অশোকচন্দ্রের চোখ পড়ল বারান্দার মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর রোগা শরীরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বারান্দার মার্বেল পাথরের মেঝেতে অনেকটা অংশ জুড়ে রোদ পড়েছে। আর একইসঙ্গে এসিজির হাতে আলতো করে ধরা চশমার ছায়াও পড়েছে সেখানে। চশমার কাচের ছায়ার মাঝখানটায় একটা করে রোদের উজ্জ্বল টিপ ঃ সূর্যের প্রতিবিম্ব।

এসিজি চশমাটা বারকয়েক নেড়েচেড়ে কাচের ছায়া দুটো লক্ষ করলেন। যদিও চোখে চশমা না থাকায় লক্ষ করার কাজটা খুব ভালোভাবে করা যাচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বুঝতে কোনওরকম অসুবিধে হল না।

চশমাটা চোখে দিয়ে পরমেশ্বরবাবুর জানলার কাছে এগিয়ে

গেলেন অশোকচন্দ্র। জানালার কাচে টোকা দিয়ে রঘুপতিদের ইশারা করে বাইরে আসতে বললেন। তারপর আপনমনেই হেসে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ হুনুর।

'কী ব্যাপার, গুপ্তাসাব? এনি সলিউশান?' কাছে এসে দাঁড়ানো-মাত্রই কৌতূহলী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রঘুপতি যাদব।

উত্তরে অশোকচন্দ্র হেসে বললেন, 'আমি একটা খাঁটি গর্দভ, রঘুপতি। বুঝতে পারছি, ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনায় আমার অনেক ফাঁক থেকে গেছে। বিশেষ করে অপটিক্সে—মানে, আলোক-বিজ্ঞানে···।'

'আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না—' হতবুদ্ধি-ভাবে মন্তব্য করলেন বিজন শর্মা।

এসিজি শর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মার্ডার মিষ্ট্রি আমি এখনও সল্‌ভ করতে পারিনি, তবে বন্ধ ঘরের মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পেরেছি।'

রঙ্গলাল বললেন, 'অধম এখনও ইন অন্ধকার / আজ্ঞা হোক খুলে বলিবার।'

এসিজি মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে বিজন শর্মাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি অর্কদেববাবুকে একবার এখানে আসতে বলুন। আর ওঁর দু-বোনকেও আসতে বলবেন।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁরা তিনজনে বারান্দায় এসে হাজির। অর্কদেব চেষ্টা করে শান্ত স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখেছেন। তবে ঈশানী ও হিমানীর মুখে বিরত ও বিরক্ত ভাব বেশ স্পষ্ট।

অর্কদেব নরম গলায় বললেন, 'ওপরের কাজ হয়ে গেলে নীচে চলুন—সেখানে আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এসিজি মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাব—তবে তার আগে একটু জরুরি কাজ সেরে নেব।'

তারপর সরাসরি হিমানীর চোখে তাকিয়ে কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন বললেন, 'হিমানীদেবী, আপনার কাছে কি চার-পাঁচ ইঞ্চি ডায়ামিটারের কোনও ম্যাগনিফাইং গ্লাস—মানে, আতসকাচ আছে?'

চশমার পিছন থেকে কয়েক সেকেন্ড ঠান্ডা চোখে অপলকে অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন হিমানী। তারপর বললেন, 'সবই বুঝতে পেরেছেন তা হলে?'

অর্কদেব আর ঈশানী অবাক চোখে ছোট বোনের দিকে তাকালেন।

হিমানীর বাঁকা প্রশ্নের উত্তরে এসিজি হেসে বললেন, 'না, সবটা বুঝতে পারিনি—যেটুকু পেরেছি বলি—ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন।

'সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে কোনও এক সময় আপনি পরমেশ্বরবাবুর ঘরে এসেছিলেন—হয়তো ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলার ছিল। আপনি এসে দেখলেন, ঘরের দরজা-জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। আর বারান্দার লাগোয়া ওই জানলার কাছে টেবিলে মাথা রেখে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন আপনার বাবা।

'এ ছাড়াও কয়েকটা জিনিস দেখতে পেলেন আপনি। অর্ধেক খাওয়া চায়ের কাপ, তার কাছাকাছি একটা কাগজ, আর অ্যাশট্রের খাঁজে রাখা একটা গোটা সিগারেট।

'পরমেশ্বরবাবু যে সুইসাইড করেছেন, সেটা বুঝতে আপনার বিশেষ কষ্ট হল না। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, আপনার মনে হল ব্যাপারটা একটু জট পাকিয়ে দেওয়া যাক। তাই ঘর থেকে আতসকাচটা নিয়ে এলেন। এই বারান্দায় তখন রোদ এসে পড়েছিল। ওই কাচের জানলা দিয়ে সেই রোদ পরমেশ্বরবাবুর টেবিলে গিয়েও পড়েছিল। সুতরাং, এরপর আপনার কাজ হল, আতসকাচ দিয়ে সূর্যকে ফোকাস করে টেবিলের ওপরে ফেলা। বড় ডায়ামিটারের আতসকাচ থাকলে কাজটা মোটেই কঠিন নয়।

'তারপর আততায়ী তার যা-কাজ তা-ই করেছে। সিগারেট ধরিয়েছে, কাপের চা গরম করেছে, আর টেবিলে পড়ে থাকা কাগজটা পুড়িয়েছে। আমার ধারণা, কাগজটা পরমেশ্বরবাবুর সুইসাইড নোট ছিল—তাতেই স্পষ্ট লেখা ছিল, কেন তিনি আত্মহত্যা করছেন— ।'

এসিজির কথা শেষ হল।

সবাই ভাবছিল, হিমানী নিশ্চয়ই চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন, অথবা কান্নায় ভেঙে পড়বেন। কিন্তু হিমানী কোনওটাই করলেন না। বরং ঠান্ডা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ডক্টর গুপ্ত। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার ঘরেই আছে। আমার রিসার্চের কাজে লাগে—গ্রাফ থেকে কোনও ভ্যালু নেওয়ার সময়, কিংবা কোনও ফটোগ্রাফ খুঁটিয়ে দেখার সময়। আপনি ফিজিক্সের লোক—আপনি বুঝতে পারবেন।' চোখের চশমাটা একবার ঠিক করে নিলেন হিমানী। তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন, 'বাবার দিন-দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মানসিক অবসাদে হয়তো ভুগছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে ভীষণ বদমেজাজি আর খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের তিনজনের সঙ্গে তো প্র্যাকটিক্যালি চাকর-বাকরদের মতো ব্যবহার করতেন।'

'কিন্তু প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল সুইসাইডটাকে আপনি হঠাৎ জট পাকাতে গেলেন কেন?' বিজন শর্মা হিমানীর কাছে জানতে চাইলেন।

'দাদার জন্যে।' নিষ্প্রাণ গলায় স্পষ্ট উত্তর দিলেন হিমানী। তারপর অর্কদেবের দিকে ফিরে বললেন, 'দাদা, কিছু মনে কোরো না। তোমার লোভ তোমাকে একটু-একটু করে অন্যরকম করে দিচ্ছে। বাবার সঙ্গে তোমার যেসব ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত তার অনেকটাই আমার কানে এসেছে। তোমার হাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে আমি বা দিদি কেউই

নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। এ নিয়ে আমাদের খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার। বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারটা আগে মিটে যাক—।'

অর্কদেবের চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

ঈশানী চোখে আঁচল চেপে হঠাৎই কাঁদতে শুরু করলেন।

এসিজি রঘুপতিকে বললেন, 'রঘুপতি, আমার কাজ শেষ—এবার আমি যাই। তুমি আর শর্মা মিলে এই ব্যাপারটা নিয়ম-টিয়ম মেনে ফাইলবন্দী করো।'

বিজন শর্মা এসিজিকে বললেন, 'চলুন, ডক্টর গুপ্ত, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' হেল্প করার জন্যে মেনি থ্যাংক্স।

অর্কদেব কাছে এগিয়ে এসে খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'একটু চা না খেয়ে যেতে পারবেন না...প্লিজ...।'

অশোকচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে রাজি হলেন।

রঘুপতি বলল, 'শর্মা, চায়ের পর তা হলে ফরমালিটিগুলো সেরে নেওয়া যাবে।'

অর্কদেব ওঁদের চারজনের সঙ্গে নীচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোলেন। ঈশানী আর হিমানী একইভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

যেতে-যেতে অর্কদেব বললেন, 'কাল সকালে সিগারেট খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে রাগারাগির সময় বাবার লাইটারটা আমিই কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম...কিন্তু তারপর...এরকম সব ব্যাপার হবে বুঝিনি।'

রঙ্গলাল এসিজিকে প্রশ্ন করলেন, 'হিমানীদেবীকে আপনি কী করে সন্দেহ করলেন, স্যার?'

'লেন্সের ব্যাপারটা বুঝতে পারার পরই মনে হয়েছিল এটা বোধহয় বিজ্ঞান জানা কোনও লোকের কাজ। আর সেরকম লোক

তো এ-বাড়িতে একজনই…। কিন্তু আতসকাচ নিয়ে ওইসব কাণ্ড করার সময় হিমানীকে দোতলার বারান্দায় কেউ দেখতে পেল না, এটা ভাবতেই অবাক লাগছে!'

এসিজির এই সমস্যার সমাধান করে দিল দুই মূর্তিমান: তুতুন আর মিমো।

মশা-মাছি সমস্যার সমাধান করে দুটো বাচ্চাই উন্মুখ হয়ে বৃদ্ধ গোয়েন্দার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এসিজি ওদের বললেন, 'ধাঁধার উত্তর শোনার আগে তোমাদের একটা প্রশ্ন করব। কাল সকালে দোতলায় তোমাদের ঠাকুরদার বারান্দায় কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?'

ওরা একইসঙ্গে জানাল, হ্যাঁ। ছোটপিসি বারান্দায় ঠাকুরদার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। হাতে সেই বড় কাচটা ছিল—যেটা দিয়ে লেখা বড়-বড় দেখায়। ওরা তখন বাগানে খেলছিল।

অশোকচন্দ্র আপনমনেই হাসলেন। ওদের সঙ্গে কথা বললে অনেক আগেই বন্ধ ঘরের রহস্যের সমাধান হয়ে যেত। বাচ্চারা বড়দের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।

এইবার তিনি মশা-মাছির সমস্যার উত্তর জানতে চাইলেন বাচ্চা দুটোর কাছে।

উত্তরে মিমো প্রথমে বলল, 'মশা জিতবে, মাছি হেরে যাবে।'

এসিজি জিগ্যেস করলেন, 'কেন?'

'মশা মাছিটাকে তাড়া করে হুল ফুটিয়ে সব রক্ত টেনে নেবে। তাতে মাছিটা উইক হয়ে গিয়ে মারা যাবে।'

তখন তুতুন বলল, 'না, জেঠু, দুজনেই মরে যাবে। মশা মাছিটাকে কামড়ে দিলে মাছিটার ম্যালেরিয়া হবে, আর মাছির থেকে মশার হবে কলেরা—তাতে দুজনেই মরে যাবে।'

তুতুনের উত্তর শুনে কেউ আর হাসি চাপতে পারলেন না।

অশোকচন্দ্র পকেট থেকে টাকা বের করে অর্কদেবকে অনুরোধ

করলেন কাউকে দিয়ে দুটো ক্যাডবেরি চকোলেট আনিয়ে দেওয়ার জন্য। ওদের প্রাইজ।

রঙ্গলাল গোস্বামী মাথা নেড়ে বললেন, 'কোশ্চেনটা ছিল শক্ত, ছিল ইন্টারেস্টিং / মশা-মাছি দুজনেই ইকোয়াফাইটিং।'

রঘুপতি যাদব অবাক হয়ে রঙ্গলালকে প্রশ্ন করলেন, 'ইকোয়া-ফাইটিং মানে?'

সলজ্জ হেসে রঙ্গলাল বললেন, 'ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান। "ইকোয়াল ইন ফাইটিং"-কে প্রথমে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের নিয়মে সমাসবদ্ধ করেছি। তারপর নিপাতনে বয়েল করে সন্ধি করে ছেড়ে দিয়েছি।'

অশোকচন্দ্র গুপ্ত খোলা গলায় হেসে উঠে বললেন, 'স্বভাবকবিবর, আপনার সত্যি কোনও জবাব নেই।'

রঙ্গলাল বললেন, 'স্বভাবকবিতায় ব্যাকরণের অ্যাপ্লিকেশানটাই আসল, স্যার।'

———